www.alkawsar.com

مجلة الكوثر الشهرية

تصدر عن مركز الدعوة الإسلامية داكا (للبحوث والدراسات العليا وشؤون الدعوة)

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক

প্রতিষ্ঠা

মুহাররম ১৪২৬ হি., ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ঈ.

প্রতিষ্ঠাকালীন উপদেষ্টা

হযরত মাওলানা আবদুল হাই পাহাড়পুরী রাহ.

তত্ত্বাবধায়ক

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

সম্পাদক

মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

সহ-সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ

বিনিময় : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সর্বপ্রকার যোগাযোগ

মাসিক আলকাউসার
৩০/১২, পল্লবী
(মিরপুর-১২) ঢাকা-১২১৬

E-mail : info@alkawsar.com

সার্কুলেশন

০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৩৩ (এজেন্ট)
০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৪৪ (গ্রাহক)
০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৫৫ (হাতে হাতে)

সম্পাদনা বিভাগ

০১৯৮৪-৯৯৮৮২২

০১৭১০-৮৩৮৩৭৯

ব্যাংক একাউন্ট নম্বর

মাসিক আলকাউসার
১. চলতি হিসাব নং ১৩৫১২২০০০০১৭৩
আলআরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
পল্লবী শাখা, ঢাকা

২. চলতি হিসাব নং ১৬৪.১১০.১৭৯৩
ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড
মিরপুর-১০ শাখা, ঢাকা

বর্ষ : ১৪, সংখ্যা : ০৩

জুমাদাল আখিরাহ ১৪৩৯ ॥ মার্চ ২০১৮ ॥ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৪

সূচিপত্র

স্বাধীনতা

....

ইসলামেই মুক্তি, ইসলামেই স্বাধীনতা

মুক্তি ও স্বাধীনতার চাহিদা মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা। মানুষ মুক্তি চায়, মুক্ত ও স্বাধীন থাকতে চায়। পরাধীনতার শৃঙ্খলে তার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। মানুষের স্বভাবের এই মুক্তিপ্রিয়তা একটি প্রয়োজনীয় প্রেরণা। এটি কল্যাণকর হতে পারে, যদি তা সঠিক ক্ষেত্রে, সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। তদ্রূপ এই প্রেরণাই হয়ে উঠতে পারে মানুষের ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনে অনিষ্ট-অকল্যাণের কারণ, যদি এর অপব্যবহার বা ভুল ব্যবহার হয়। অর্থাৎ মানুষের সকল প্রেরণার মতো এই প্রেরণাও একটি শক্তি, যার সঠিক ব্যবহার মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

ইসলামী শিক্ষা ও দাওয়াতের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানবীয় যোগ্যতা ও প্রেরণাসমূহের সঠিক ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের নির্দেশনা। পরিভাষায় একে বলা হয় 'হিদায়া' (পথনির্দেশ, সুপথে পরিচালনা)। কুরআনে কারীমের প্রথম দুই সূরায় 'হিদায়া' প্রসঙ্গটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। প্রথম সূরা– সূরাতুল ফাতিহায় তা এসেছে বান্দার প্রার্থনারূপে–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

'আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন।'

আর দ্বিতীয় সূরা– সূরাতুল বাকারার শুরুতেই তা এসেছে নির্দেশনারূপে। বান্দাকে জানানো হয়েছে–

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

'এই সেই কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই, এটি মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত।'

বস্তুত 'হেদায়েত'ই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, যা দ্বারা তার সকল যোগ্যতা ও প্রেরণার যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। বলাই বাহুল্য যে, যেকোনো শক্তির যথার্থ ব্যবহারই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়।

এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে সফররত দুটি কাফেলা। একটি গন্তব্যের দিকে সঠিক পথে চলছে আর একটি চলছে ভুল পথে। উভয় কাফেলা পথ চলছে এবং তাদের চলার শক্তি ব্যবহার করছে। কিন্তু উভয় কাফেলার পরিণাম এক নয়।

যে কাফেলা সঠিক পথে চলছে, তার ব্যবহৃত শক্তি তাকে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে আর যে কাফেলা ভুল পথে চলছে সে তো গন্তব্যের দিকে এগুচ্ছেই না; বরং গন্তব্য থেকে বহু দূরে সরে যাচ্ছে। একারণে শুধু শক্তি যথেষ্ট নয়, শক্তির যথার্থ ব্যবহারও জরুরি। মানবের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের জন্য 'হেদায়েত' ও নির্ভুল নির্দেশনা তাই অপরিহার্য। মানবস্বভাবের মুক্তি ও স্বাধীনতার যে প্রেরণা এরও সঠিক বিকাশ ঘটে আল্লাহ-প্রদত্ত হেদায়েতের মাধ্যমে।

মুক্তিকামী মানব-স্বভাবের সাথে ইসলামী দাওয়াত কত সামঞ্জস্যপূর্ণ! মানুষও মুক্তি পেতে চায়, ইসলামও এসেছে মুক্তি দেয়ার জন্য। ইসলাম মানুষকে পরিচিত করে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রকৃত সংজ্ঞা ও ক্ষেত্রসমূহের সাথে। ফলে ইসলামী জ্ঞানে আলোকিত হৃদয় ও মস্তিষ্ক কখনো এই ক্ষেত্রে প্রতারিত হয় না। জীবন ও জগতে পরাধীনতার ক্ষেত্রগুলো তার সামনে স্পষ্ট থাকে। মুক্তি ও স্বাধীনতার উপায় সম্পর্কেও সে থাকে ওয়াকিফহাল।

মুক্তিকামী মানব-স্বভাবের সাথে ইসলামী দাওয়াত কত সামঞ্জস্যপূর্ণ! মানুষও মুক্তি পেতে চায়, ইসলামও এসেছে মুক্তি দেয়ার জন্য। ইসলাম মানুষকে পরিচিত করে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রকৃত সংজ্ঞা ও ক্ষেত্রসমূহের সাথে। ফলে ইসলামী জ্ঞানে আলোকিত হৃদয় ও মস্তিষ্ক কখনো এই ক্ষেত্রে প্রতারিত হয় না। জীবন ও জগতে পরাধীনতার ক্ষেত্রগুলো তার সামনে স্পষ্ট থাকে। মুক্তি ও স্বাধীনতার উপায় সম্পর্কেও সে থাকে ওয়াকিফহাল।

ইসলামী দাওয়াতের এক দায়ী হযরত রিবয়ী ইবনে আমের রা.-এর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল ইসলামী দাওয়াতের এই মর্মবাণী। পারস্য-সেনাপতি রুস্তমের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন– 'আমরা এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছি, মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে এক আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত করার জন্য; পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়ে পৃথিবীর প্রশস্ততার দিকে নিয়ে আসার জন্য এবং সকল ধর্ম ও মতবাদের যুলুম-অবিচার থেকে মুক্ত করে ইসলামের সাম্য ও সুবিচারের ছায়াতলে নিয়ে আসার জন্য।'

ইসলামের এই প্রাজ্ঞ দায়ী, আল্লাহর পথের এই মুজাহিদের কণ্ঠে উচ্চারিত এই বাক্যগুলোতে যেমন ধ্বনিত হয়েছে ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তেমনি নির্দেশিত হয়েছে মানুষের দাসত্ব ও মুক্তির ক্ষেত্রগুলোও।

আর তা উচ্চারিত হয়েছিল তৎকালীন বিশ্বের এক 'সুসভ্য' পরাশক্তির মহাক্ষমতাধর সেনাপতির সম্মুখে। অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্বে শক্তি-সভ্যতায় অনন্য জাতিটি দাসত্বের যে ডাণ্ডা-বেড়িতে বন্দী-জীবন যাপন করছিল তার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল মুসলিম বাহিনীর এই মহান দায়ী ও মুজাহিদের উচ্চারণ।

সেই দাসত্বের প্রধান শিরোনাম হচ্ছে, সৃষ্টির উপাসনা। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ। গোটা বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা তিনি। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য আর পৃথিবীর সকল কিছুকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য; মানুষেরই কল্যাণার্থে। অথচ যুগে যুগে অসংখ্য মানুষ, অসংখ্য জাতি-গোষ্ঠী সৃষ্টির উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে। অসংখ্য কল্পিত দেব-দেবীর উপাসনা ও প্রভুত্বের শৃঙ্খলে নিজেদের আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ করেছে। ইসলাম এসেছে মানবজাতিকে এই পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য।

মনুষ্যসমাজেও একশ্রেণির মানুষ প্রভুর আসনে সমাসীন হয়েছে; শক্তি, ক্ষমতা, নানাবিধ কুসংস্কার ও মতাদর্শের ভিত্তিতে এরা উঠে যায় সকল জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে। পক্ষান্তরে মানুষের বৃহত্তর শ্রেণিটি নেমে আসে দাসের পর্যায়ে, বঞ্চিত হয় যুক্তিসঙ্গত অধিকার থেকেও। মনুষ্যসমাজের এই দাস-প্রভুর সমীকরণ সমাজে অন্যায়-অবিচারের বিস্তার ঘটায়। মানুষের জান-প্রাণ, অর্থ-সম্পদ, ইজ্জত-আব্রুকে অনিরাপদ করে তোলে। বাহ্যত এই মানুষগুলো মুক্ত-স্বাধীন হলেও এরা বাস করে ভয় ও আতঙ্ক, অবিচার ও বঞ্চনার যিন্দানখানায়। ইসলাম মানুষে-মানুষে প্রভু-ভৃত্যের এই সংস্কৃতি নির্মূল করেছে। তার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা– সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। তিনিই একমাত্র রব, প্রভু ও পরওয়ারদেগার। তাঁরই আদেশ পালনে সবাই বাধ্য। তাঁর বিধানে কেউ জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নয়। আইন ও অধিকারের এই সাম্যই তো মুক্তি ও স্বাধীনতা।

বন্দিত্বের আরেক বিস্তৃত ও ভয়াবহ রূপ হচ্ছে, নানা অহেতুক রীতি-নীতিতে ভারাক্রান্ত জীবন। মানুষ যখন জীবন ও কর্মে আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করে তখন ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সে বন্দি হয়ে পড়ে অসংখ্য মনগড়া বিধি-নিষেধের নিগড়ে। যে জীবনে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ভরসার অবলম্বন নেই সেই জীবনে সংশয় ও অস্থিরতার কোনো শেষ নেই। তেমনি জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে– শিক্ষা-দীক্ষা, বিয়ে-শাদি, দাম্পত্য, সামাজিক মান-মর্যাদা, আয়-ব্যয় ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে এমন সব রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, বাস্তবে যেগুলোর কোনোই অর্থ নেই। এ যেন এক স্বেচ্ছাবন্দিত্ব। সমাজের প্রচলিত ধারা ও ব্যবস্থাই এই অপ্রয়োজনীয় ভার বহনে মানুষকে বাধ্য করে।

বন্দিত্বের আরেক রূপ হচ্ছে, মানবরচিত নানা মতবাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া? যুগে যুগে কত মতবাদ রচিত হয়েছে আর বিলুপ্ত হয়েছে কে তার হিসাব রাখে? আসমানী ধর্মসমূহের যে বিকৃত রূপ সে-ও তো এক অর্থে মানবরচিত মতবাদ। ধর্মের পাদ্রি-পুরোহিতেরা মূল ধর্ম-ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে তদস্থলে নানা মনগড়া চিন্তা ও বিশ্বাসের বাধ্যবাধকতা, বিভিন্ন আরোপিত রীতি-নীতি পালনের আবশ্যকতা ঘোষণা করেছে, যার ভার মানবজাতিকে বহন করে যেতে হচ্ছে। এইসব আরোপিত রীতি ও বিশ্বাসের কারণে যুগে যুগে কত যে মানুষের প্রাণহানী, সম্পদহানী ও সম্মানহানী ঘটেছে তার খবর কে রাখে? যুগে যুগে বিপ্লবের বার্তা নিয়ে একেক মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে আর লক্ষ-কোটি আদমসন্তানের মেধা-শ্রম-আয়ু এর প্রচার-প্রতিষ্ঠায় শেষ হয়ে গিয়েছে। কিছুকাল পর এর অসারতা প্রমাণিত ও প্রকাশিত হওয়ার পর লোকেরা আরেক মতবাদের পেছনে পঙ্গপালের মত ছুটে গিয়েছে। এই যে বন্দিত্ব ও দাসত্ব এর কি কোনো জবাব আছে?

মানুষ তো চিরজীবী নয়, তার আয়ুও লক্ষ বছরের নয়। প্রত্যেক মানুষকে নিজ নিজ বিশ্বাস ও কর্ম নিয়েই জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তাহলে বিভ্রান্তির এত চোরাগলিতে ঘুরে মরার অবকাশ মানুষের জীবনে কোথায়?

এই সকল প্রকারের বন্দিত্বের শৃঙ্খল থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। মানুষের কর্তব্য, স্বাধীনতা ও পরাধীনতার স্বরূপ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে মুক্তির পথের পথিক হওয়া।

আল্লাহ তাআলার মহা অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের ঈমানের সম্পদ দান করেছেন, ইসলামের মাধ্যমে আমাদের দান করেছেন এক যথার্থ বিশ্বাস-ব্যবস্থা ও ইবাদত-ব্যবস্থা, যা সবরকমের ভ্রান্তি, বিচ্যুতি ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত। ইসলামের কল্যাণেই আমরা লাভ করেছি এক সাম্য ও সুবিচারভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা, এক যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা।

এই মহা নিআমতের মূল্যায়ন ও শোকরগোযারি আমাদের কর্তব্য। আর আমাদের ব্যক্তি-জীবন, পারিবারিক-জীবন, সমাজ-জীবন ও রাষ্ট্রীয়-জীবন যে অশান্তি-অস্থিরতা, অনাচার-অরাজকতা, অবক্ষয়-উচ্ছৃঙ্খলায় ভারাক্রান্ত; এর কারণ– ইসলামের জীবন-ব্যবস্থা ত্যাগ করে অনৈসলামিক জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ। ফলে মুসলিম হয়েও আমরা যাপন করে চলেছি এক বন্দী-জীবন।

আমাদের কর্তব্য, আবারো ইসলামের দিকে ফিরে আসা। পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামে দাখিল হওয়া। তাহলেই আমরা আবার মুক্ত হব, স্বাধীন হব। ●

ইসলাম মানুষে-মানুষে প্রভু-ভৃত্যের এই সংস্কৃতি নির্মূল করেছে। তার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা– সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। তিনিই একমাত্র রব, প্রভু ও পরওয়ারদেগার। তাঁরই আদেশ পালনে সবাই বাধ্য। তাঁর বিধানে কেউ জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নয়। আইন ও অধিকারের এই সাম্যই তো মুক্তি ও স্বাধীনতা।

বন্দিত্বের আরেক বিস্তৃত ও ভয়াবহ রূপ হচ্ছে, নানা অহেতুক রীতি-নীতিতে ভারাক্রান্ত জীবন। মানুষ যখন জীবন ও কর্মে আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করে তখন ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সে বন্দি হয়ে পড়ে অসংখ্য মনগড়া বিধি-নিষেধের নিগড়ে।

দেশ-বিদেশের কিছু ঘটনা : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ

মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা রাজ্যের একটি স্কুলে আবারও ফায়ারিংয়ের ঘটনা ঘটল। স্কুলের সাবেক ছাত্র নিকোল্স ক্রুজ (১৯) স্কুলে এসে এলোপাতাড়ি গুলি করে। এতে ১৭ জন নিহত এবং অনেকে আহত হয়েছে।

আমেরিকার স্কুলে ফায়ারিংয়ের এটা নতুন ঘটনা নয়। ইতিপূর্বে এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনায় শত শত ছাত্রের মৃত্যু ঘটেছে। শুধু চলতি বছরের দেড় মাসের মধ্যেই এটি ১৮তম ঘটনা। এ প্রসঙ্গে একটি বিদেশি পত্রিকা থেকে বিগত দুই দশকের কয়েকটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরছি।

১৯৯৯ সালের এপ্রিলে কলোরাডোর একটি হাইস্কুলে ১৭ ও ১৮ বছরের দুই কিশোর ফায়ারিং করে শিক্ষকসহ ১২ জন ছাত্রকে হত্যা করে। এরপর নিজেরাও আত্মহত্যা করে। সে ঘটনায় ২০ জনেরও বেশি আহত হয়েছিল।

১৯৯৯-এর নভেম্বরে নিউ ম্যাক্সিকোর একটি স্কুলে ভিক্টর কর্ডোভা জুনিয়র (১২) তার সহপাঠী ছাত্রীকে গুলি করে হত্যা করে। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

২০০০-এর ফেব্রুয়ারিতে মিশিগান রাজ্যের একটি স্কুলেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ওখানে তো ৬ বছর বয়সের এক শিশু তার সহপাঠী এক ছাত্রীকে গুলি করে হত্যা করে। অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে তাকে কোনো শাস্তি দেয়া না হলেও সে যে নারীর সাথে থাকত তাকে দায়িত্বে অবহেলা ও অস্ত্র শিশুর হাতের নাগালে রাখার কারণে ১৫ বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়।

একই বছরের মে মাসে ফ্লোরিডার একটি স্কুলে ১৩ বছর বয়সের একটি ছাত্র স্কুলে তার শেষ দিনে গুলি করে তার শিক্ষককে হত্যা করে। অপরাধ প্রমাণ হওয়ার পর তাকে ২৮ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

২০০১-এর মার্চে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তানা হাই স্কুলে ১৫ বছর বয়সের ছাত্র চার্স এন্ডি উইলিয়াম্স এলোপাতাড়ি গুলি করে ২ ছাত্রকে হত্যা করে। এ ঘটনায় ১৩ জন আহত হয়। তাকে ৫০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

২০০৩-এর সেপ্টেম্বরে মেনিসোটার একটি স্কুলেও সহাপাঠীর গুলিতে ২ জন নিহত হয়। একই রাজ্যে ২০০৫-এর মার্চে জেফ ওয়াইয (১৬) তার দাদা ও দাদার বন্ধুকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর রেড লেক ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনে অবস্থিত স্কুলে গিয়ে পাঁচ ছাত্র, এক শিক্ষক ও সিকিউরিটি গার্ডকে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করে। একই বছরের নভেম্বরে টেনিসি অঙ্গরাজ্যের একটি হাইস্কুলে ফায়ারিংয়ের ঘটনা ঘটে। ১৫ বছর বয়সী ঐ কিশোরের হাতে একজন নিহত ও দুইজন আহত হয়।

২০০৬-এর সেপ্টেম্বরে WISCONSIN রাজ্যে ১৫ বছর বয়সী এরিক হেন স্টক স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল জন ক্লাঙ্গ (৪৯)-কে গুলি করে হত্যা করে।

ঘটনার আগের দিন প্রিন্সিপ্যাল স্কুলে সিগারেট আনার বিষয়ে তাকে সতর্ক করেছিলেন।

২০০৮-এর ফেব্রুয়ারিতে ILLINOIS রাজ্যের একটি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। বন্দুকবাজ হলে ঢুকে গুলি করে ৫ ছাত্রকে হত্যা করে এবং ১৮ জনকে আহত করে। এরপর সে নিজেও আত্মহত্যা করে।

২০০৮-এর অক্টোবরে আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব সেন্ট্রাল আরকেনসাসের ৪ অস্ত্রধারীর গুলিবর্ষণে দুই ছাত্র নিহত হয়।

২০১২-এর ফেব্রুয়ারিতে স্কুল হত্যাকাণ্ড ঘটে ওহাইয়ো রাজ্যের চারডেন শহরে। এতে ৩ ছাত্র নিহত হয়। একই বছরের ডিসেম্বরে অনুরূপ ঘটনা ঘটে কানেকটিকাট রাজ্যে। ২০ বছর বয়সী এডাম লযনুয প্রথমে নিজের মা নেন্সিকে ঘরে গুলি করে হত্যা করে. এরপর নিউটাউন এলাকায় অবস্থিত একটি স্কুলে গিয়ে গুলিবর্ষণ করে। এতে ২৬ জন নিহত হয়, যাদের মধ্যে ২০ জন ছিল ফার্স্টগ্রেডার। এরপর সে নিজেও আত্মহত্যা করে।

এরূপ ২০১৪-এর জুনে অরিগন রাজ্যের একটি হাইস্কুলে, ২০১৫-এর পয়লা অক্টোবর একই রাজ্যের একটি কমিউনিটি কলেজে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। প্রথম ঘটনায় একজন ছাত্র নিহত ও এক শিক্ষক আহত হয়। দ্বিতীয় ঘটনায় ৯ জন নিহত হয়। এরপর পুলিশের গুলিতে হত্যাকারী মার্সারও নিহত হয়।

২০১৭-এর ডিসেম্বর নিমেকিসকো রাজ্যের একটি স্কুলে ২১ বছর বয়সী এক বহিরাগত স্কুলছাত্রের বেশে স্কুলে প্রবেশ করে গুলি করে ২ ছাত্রকে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করে।

২০১৮-এর জানুয়ারিতে কানেকটিকাট রাজ্যের মার্শাল হাইস্কুলে সহপাঠীর গুলিতে দুইজন নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে।

এ হচ্ছে সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বের এক নম্বর রাষ্ট্র আমেরিকার শুধু স্কুল-হত্যাকাণ্ডের কিছু বিবরণ।

সর্বশেষ হত্যাকাণ্ডের পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হত্যাকারীর পক্ষে যেন সাফাই গেয়ে বললেন, সে অসুস্থ ছিল। তার এই বক্তব্যে অনেকেই আশ্চর্য হয়েছেন। কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, এরকমের ঘটনা কোনো মুসলিমের মাধ্যমে সংঘটিত হলে গোটা যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া ও প্রশাসনের পরিস্থিতি কী দাঁড়াত?

এই অন্যায় ও বৈষম্যমূলক আচরণ এখন অনেকটাই নিয়মিত। আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ১৭ ছাত্র হত্যার ঘটনার ২/৩ ঘণ্টার মধ্যেই এ নিয়ে গণমাধ্যমে আর কোনো মাতামাতি নেই। সুদূর বাংলাদেশের বাংলাভাষায় প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোও যেন অদৃশ্য কোনো কারণে একেবারেই নীরব হয়ে গেল। অথচ এর চেয়ে অনেক কম মর্মান্তিক বিষয়ও আমাদের মিডিয়া দিনের পর দিন ফলাও করে প্রচার-প্রচারণা,

সর্বশেষ হত্যাকাণ্ডের পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হত্যাকারীর পক্ষে যেন সাফাই গেয়ে বললেন, সে অসুস্থ ছিল। তার এই বক্তব্যে অনেকেই আশ্চর্য হয়েছেন। কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, এরকমের ঘটনা কোনো মুসলিমের মাধ্যমে সংঘটিত হলে গোটা যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া ও প্রশাসনের পরিস্থিতি কী দাঁড়াত? এই অন্যায় ও বৈষম্যমূলক আচরণ এখন অনেকটাই নিয়মিত। আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ১৭ ছাত্র হত্যার ঘটনার ২/৩ ঘণ্টার মধ্যেই এ নিয়ে গণমাধ্যমে আর কোনো মাতামাতি নেই।

আলোচনা-পর্যালোচনা অব্যাহত রাখে। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার বিরুদ্ধে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা নিয়ে দমে যাওয়া বা অদৃশ্য শক্তির চাপে চুপসে যাওয়ার যে অভিযোগ রয়েছে এটি কি তারই আরেকটি প্রমাণ?

আমেরিকার জন-জীবনে মানসিক ও পারিবারিক অস্থিরতার পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্রের সহজলভ্যতা এর বড় কারণ। নির্বিচার গুলিবর্ষণের অসংখ্য ঘটনার পরও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণের কার্যকর কোনো প্রয়াস বাস্তবায়িত না হওয়ার পেছনে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের গান-লবি এবং সে দেশের প্রেসিডেন্টের সাথে এই লবির দহরম-মহরম। পুঁজিবাদী স্বার্থ ও বিশ্বব্যাপী অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির ফল যে খোদ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক হচ্ছে না– এই সকল ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও তাদের শুভবুদ্ধি উদয়ের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এ সকল বাস্তবতা থেকে মুসলমানদের কর্তব্য; পশ্চিমা বস্তুবাদী শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থার বিধ্বংসী রূপটি উপলব্ধি করে নেয়া। যেখানে একজন মা তার সন্তানকে স্কুলে পাঠিয়ে পুরো সময় চিন্তিত থাকেন যে, তার ছেলে আদৌ ঘরে ফিরবে কি না, সে দেশের শান্তির মাত্রা বোঝার জন্য আর কোনো সূচকের প্রয়োজন হয় না।

এই সুযোগে আমরা কওমী মাদরাসার বিভিন্ন স্তরের বোর্ডগুলোর দায়িত্বশীলদের কাছেও সবিনয় আরজ করব, সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার এই বিধ্বংসী ধারার সংক্রমণ থেকে আমাদের দ্বীনী শিক্ষাধারাকে রক্ষা করার জন্য এখনই পুরোপুরি সতর্ক হওয়া দরকার। উস্তায-শাগরিদ ও সর্বস্তরের দায়িত্বশীলদের এই চেতনা দৃঢ়ভাবে পোষণ করতে হবে যে, সনদ ও সার্টিফিকেট মুখ্য নয়, ইলম অর্জন করাই মুখ্য। মজবুত ইসতি'দাদ ও তাফাক্কুহ ফিদ্দীন অর্জনে সক্ষম না হলে হাজারো কাগুজে সার্টিফিকেটে কোনো কাজ হবে না। মূল যোগ্যতা অর্জনে উদাসীন হয়ে সার্টিফিকেট অর্জনের রাস্তা হচ্ছে জীবন ধ্বংস করার রাস্তা। কাজেই আলিম-তালিবে ইলম সবাইকে এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন হতে হবে।

ইরান-ভারত

আন্তর্জাতিক অঙ্গনের আরেকটি বিষয়ও এখন বেশ আলোচিত। তা হচ্ছে, ইরান-ভারত দহরম-মহরম। সচেতন অনেকেরই চোখে পড়ে থাকবে, ইরানের প্রেসিডেন্ট রূহানীর ভারত সফরকালে হায়দারাবাদের ঐতিহাসিক মসজিদে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাকে আমন্ত্রণ করা হয়। তিনি সেখানে ভাষণও দিয়েছেন। অথচ মসজিদটি মুসলমানদের। কোনো শিয়া ব্যক্তিত্বের এ মসজিদে প্রবেশের ঘটনা এটিই প্রথম। অথচ তাকে তো কোনো শিয়া ইমামবাড়ায় নিয়ে যাওয়া যেত। মনে পড়ছে, মসজিদে নববীর সম্মানিত খতীব শায়েখ হুযাইফীর কথা। তৎকালীন ইরানী প্রেসিডেন্ট রাফসানজানীর মসজিদে নববীতে আগমন এবং রওযা যিয়ারতের সময় আবু বকর সিদ্দীক রা. ও ওমর রা. সম্পর্কে গর্হিত ও অবমাননাকর আচরণের প্রতিবাদে তিনি কড়া ভাষণ দিয়েছেন। সেসময় আরব ক্ষমতাসীনদের বিষয়টি ভালো লাগেনি। এ প্রতিবাদী ভাষণের কারণে সে সময় শায়েখ হুযাইফীকে নানা প্রকার রাষ্ট্রীয় হয়রানির শিকার হতে হয়েছিল। শায়েখ হুযায়ফী কুরআন-সুন্নাহর ইলমের কারণে ঐ সময় যা উপলব্ধি করেছিলেন তা যদি আরব রাষ্ট্রনায়কেরাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হতেন তাহলে হয়তো এখন ইয়েমেন যুদ্ধ ও ইরানের সাথে এক দীর্ঘ উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে যাওয়ার প্রয়োজন হত না।

ইরানের একটি বন্দর ভারত ভাড়া নিয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে মালামাল পরিবহনের জন্যে হলেও যুদ্ধবিদ্ধস্ত আফগানিস্তানে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা– ভিন্ন কিছুরই ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ ঘুরে ফিরে শিয়া-হিন্দু সামরিক ও অর্থনৈতিক জোট প্রতিষ্ঠার ছবিটাই ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। এর বড় প্রমাণ, ভারতে থাকাকালীন প্রেসিডেন্ট রূহানী ভারতকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ দেয়ার দাবি তুলেছেন। অর্থাৎ ভারতে ব্যাপক মুসলিম নির্যাতন হলেও জাতিসংঘে এর বিরুদ্ধে কোনো কিছুই করা যাবে না। কোনো প্রস্তাব উঠলেই ভারত তাতে ভেটো দিতে পারবে। একইভাবে শিয়ারা যতই ষড়যন্ত্র করবে তাদের পক্ষে ভেটো ক্ষমতা নিয়ে উপস্থিত থাকবে ভারত। এইসকল দৃষ্টান্ত সামনে আসার পরও কি মুসলিমদের নিজেদের মাঝে বিবাদ-বিসংবাদ ও কাদা ছোড়াছুড়িতে ব্যস্ত থাকা উচিত? এখনও যদি মুসলিমেরা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের চেতনায় উজ্জীবিত না হয় তাহলে আর কখন উজ্জীবিত হবে?

প্রশ্নপত্র ফাঁস

সাম্প্রতিক উদ্বেকগজনক দেশীয় বিষয়গুলোর একটি হচ্ছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস। সারা দেশে ব্যাপকভাবে প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে। কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি, এমনকি প্রশ্ন ফাঁসকারীকে ধরিয়ে দিলে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করেও কাজ হচ্ছে না। গোটা জাতি তাদের সন্তান ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন।

দেখা যাচ্ছে, বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিসিএসসহ প্রায় সকল পরীক্ষার প্রশ্নই ফাঁস হয়ে যাচ্ছ। অর্থাৎ পাবলিক পরীক্ষা মানেই প্রশ্ন-ফাঁস। গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থাটাই যেন হয়ে উঠেছে সার্টিফিকেট সর্বস্ব। শিক্ষার্থী কী শিখছে, তার চেয়ে বেশি নজর পরীক্ষায় গোল্ডেন-এ প্লাস পাচ্ছে কি না। ফলে শিক্ষা নয়, যে কোনো উপায়ে পরীক্ষায় ভালো ফল করাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

এই জাতি-বিধ্বংসী প্রক্রিয়ার সাথে কারা জড়িত? শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, শিক্ষকেরা। অন্যরা বলছে, প্রশ্ন তৈরি প্রক্রিয়ায় জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এর মানে, জড়িতরা সকলেই 'শিক্ষিত'। তাহলে এই জাতির ভবিষ্যত কী?

এইসব দৃষ্টান্ত বারবার আমাদের জানাচ্ছে যে, তাকওয়া, খোদাভীতি ও সুশাসন ছাড়া তথাকথিত শিক্ষা মানুষের কোনো উপকার বয়ে আনে না। এই অতি উদ্বেগজনক ব্যাপারেও কিছু খবর প্রকাশ ছাড়া কোনো বিহিত ব্যবস্থা কি নেয়া হচ্ছে? পরীক্ষা শেষ, আলোচনাও শেষ, আবার আরেকটা পরীক্ষা, আবার প্রায় সকল প্রশ্নপত্র ফাঁস। কতদিন চলবে এই তামাশা? জাতির বিবেকবান লোকদের কি জেগে ওঠা দরকার নয়?

যথাযথ পদক্ষেপের অভাবে বিষয়টি এতই ভায়াবহ রূপ ধারণ করেছে যে, দুর্বৃত্তরা যেন গোটা জাতিকে চ্যালেঞ্জ করছে। ফেসবুকে আগাম বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলে দিচ্ছে যে, যথাসময়ে অন্য প্রশ্নও ফাঁস করবে। এ প্রেক্ষাপটে ফেসবুক বন্ধের কথা ওঠায় বিভিন্ন মহল থেকে নানা ওজর-আপত্তি আসতে থাকে। যেন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন ও গোটা জাতির ভবিষ্যতের চেয়েও ফেসবুক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। প্রযুক্তির অন্ধ মোহ আর কাকে বলে?

এই সুযোগে আমরা কওমী মাদরাসার বিভিন্ন স্তরের বোর্ডগুলোর দায়িত্বশীলদের কাছেও সবিনয় আরজ করব, সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার এই বিধ্বংসী ধারার সংক্রমণ থেকে আমাদের দ্বীনী শিক্ষাধারাকে রক্ষা করার জন্য এখনই

পুরোপুরি সতর্ক হওয়া দরকার।

উস্তায-শাগরিদ ও সর্বস্তরের দায়িত্বশীলদের এই চেতনা দৃঢ়ভাবে পোষণ করতে হবে যে, সনদ ও সার্টিফিকেট মুখ্য নয়, ইলম অর্জন করাই মুখ্য। মজবুত ইসতি'দাদ ও তাফাক্কুহ ফিদ্দীন অর্জনে সক্ষম না হলে হাজারো কাগুজে সার্টিফিকেটে কোনো কাজ হবে না। মূল যোগ্যতা অর্জনে উদাসীন হয়ে সার্টিফিকেট অর্জনের রাস্তা হচ্ছে জীবন ধ্বংস করার রাস্তা। কাজেই আলিম-তালিবে ইলম সবাইকে এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন হতে হবে।

এক্ষেত্রে বোর্ডের দায়িত্বশীলগণকে গাইড-সাজেশন প্রভৃতি বন্ধের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রশ্নপত্র এমন রাখতে হবে যে, গাইড-সাজেশনে কাজ না হয়।

শোনা যায়, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় পরীক্ষার জামাতগুলোতে বছরব্যাপী পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর বিশেষভাবে মুখস্থ করানো হয়। এ প্রবণতা তালিবে ইলমদের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করার পরিবর্তে অন্ধকারের পথে নিয়ে যেতে পারে। কারণ, বাস্তব ইস্তি'দাদ ছাড়া ভবিষ্যত কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার আশা দিবাস্বপ্ন মাত্র।

কোটাপদ্ধতি

আরেকটি বিষয়ে দু-একটি কথা বলে শেষ করছি। সম্প্রতি সরকারি চাকুরিতে কোটা-ব্যবস্থার পক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলন হয়েছে। স্বাধীনতার পরপরই নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে কোটাপদ্ধতি চালু হয়। জেলার জন্য কোটা রয়েছে। উপজাতি, নারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্যও কোটা রয়েছে। এর পরিমাণ ২৫ শতাংশ। আর মুক্তিযোদ্ধার পোষ্যদের প্রাধিকার কোটা ৩০ শতাংশ।

সর্বমোট ৫৫ শতাংশ। আর মেধার মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ পান মাত্র ৪৫ শতাংশ প্রার্থী। এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। মেধা ও নৈতিকতাই নিয়োগের মাপকাঠি হওয়া উচিত। এখন পর্যন্ত যত মুক্তিযোদ্ধা নিবন্ধিত হয়েছেন তাদের পোষ্যর সংখ্যা হয়ত মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশেরও কম হবে। এক্ষেত্রে তাদের জন্য ৩০ শতাংশ চাকরির প্রাধিকার কীভাবে যৌক্তিক হতে পারে?

এ ধরনের বহু সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ফল হিসেবে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা নিয়েও বিতর্ক হতে দেখা যায়। ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা নিবন্ধনের অভিযোগও করে থাকে একেরা অন্যদের বিরুদ্ধে। দেশ-জাতির অনগ্রসরতার অনেক কারণের মধ্যে এজাতীয় ব্যবস্থাগুলোও অন্যতম।

ইসলাম বলে, দায়িত্ব যোগ্য লোককেই অর্পণ করতে হবে। অন্যথায় তা আমানতের খিয়ানত বলে গণ্য হবে। ইসলামে তো নিজ থেকে প্রার্থী হওয়া লোকদেরও পদ না দেয়ার নিয়ম রয়েছে।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ نَسْتَعْمِلَ، أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ.

অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো কর্মের প্রার্থী হয় আমরা তাকে ঐ পদে নিয়োজিত করব না। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৭৯; সহীহ বুখারী, হাদীস ২২৬১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৩৩

অনগ্রসরদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা এবং তাদের উপযোগী চাকরি ও কর্মসংস্থানের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে হবে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে অবশ্যই মেধাবী ও মুত্তাকী লোকদের নিয়োগ দিতে হবে। এটাই সকল পক্ষের জন্য কল্যাণকর। ●

দুআয়ে মাগফিরাতের আবেদন

গত ৬ জুমাদাল আখিরাহ ১৪৩৯ হিজরী/২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঈসাব্দ জুমার দিন সকালে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রাহ.-এর বড় ছাহেবযাদা জনাব কারী আহমাদুল্লাহ আশরাফ ছাহেব আখিরাতের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বিন্নুরী টাউন করাচিতে তিনি পড়াশোনা করেছেন। জামাতে কাফিয়া পর্যন্ত পড়েছিলেন তিনি। এছাড়া ঘরেই তাঁর মুহতারাম আব্বাজান ও মুহতারামা আম্মাজানের কাছে কেরাতের মশক করেছিলেন।

সম্ভবত বাইতুল মুকাররম মসজিদের একেবারে শুরু থেকেই তিনি মুয়াযযিন ছিলেন। ১৯৮৭ সালে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল করাচিতেই। তাঁর উর্দূ ছিল খুবই শানদার। আর সালামের উচ্চারণ ছিল খুবই বিশুদ্ধ এবং মনকাড়া। ইনতিকালের আগে দীর্ঘদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আগে যখন তিনি সুস্থ ছিলেন রাজনৈতিক বিষয়ে কখনো কখনো বেশ ভালো মন্তব্য করেছেন। ভালো পদক্ষেপও নিয়েছেন কখনো।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে মাগফিরাত নসীব করুন। তাঁর কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দিন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

একই তারিখে জুমার দিন সকাল দশটার দিকে মিরপুর আরজাবাদ মাদরাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা মোস্তফা আজাদ ছাহেবও চলে গেলেন। রাহিমাহুল্লাহু তাআলা।

তিনি জামিয়া কোরআনিয়া লালবাগে পড়াশোনা করেছেন। পরে হযরত সদর ছাহেব হুযূর রাহ.-এর সঙ্গে গওহরডাঙ্গা চলে গিয়েছিলেন। দাওরায়ে হাদীস পড়েছেন সেখানেই।

আনুমানিক ১৯৭৮ সাল থেকে তিনি আরজাবাদ মাদরাসায় খেদমতে নিযুক্ত ছিলেন। হযরত মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী রাহ.-এর জীবদ্দশায় সম্ভবত ১৯৯০ বা ১৯৯১ থেকে উক্ত মাদরাসার নায়েবে মুহতামিম ছিলেন। হযরতের ইনতিকালের পর ইহতিমামের দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন। দাওরায়ে হাদীসে তিনি সুনানে আবু দাউদের দরস দিতেন।

মসজিদুল আমান পল্লবীতে কয়েকবার তাঁর পেছনে জুমার নামায পড়ার তাওফীক হয়েছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে সাহসিকতার সাথে স্পষ্ট ভাষায় হক কথা বলতে দেখে ভালো লেগেছে। ঐ মসজিদের ইমাম আমাদের শাগরেদ মাওলানা শুয়াইবের কাছ থেকে শুনেছি, তিনি আনুমানিক ২৮ বছর ঐ মসজিদের খতীব ছিলেন।

আল্লাহ তাআলা হযরতকে ভরপুর মাগফিরাত নসীব করুন। জান্নাতুল ফিরদাউসে জায়গা দান করুন–আমীন।

পাঠকবৃন্দের কাছে এই দুই হযরতসহ অন্যান্য সকল মারহুমীনের জন্য দুআয়ে মাগফিরাতের দরখাস্ত করছি।

–মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
১১-০৬-১৪৩৯ হিজরী

'সাবধান, হে আমার প্রিয় আরবজাতি!'

হযরত মাওলানা সায়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদাভী রাহ.

[জাযীরাতুল আরব গোটা মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ের স্পন্দন। এখানেই অবস্থিত মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারা। এখান থেকেই উৎসারিত হয়েছে হেদায়েতের নূর এবং আলোকিত করেছে গোটা জাহান। এই ভূখণ্ডের সাথে তাই বিশ্ব মুসলিমের আত্মা ও হৃদয়ের সম্পর্ক। এই ভূখণ্ডের শাসন-ক্ষমতায় যারা আসেন তাদের পরিচয় তো 'খাদিমুল হারামাইন আশ-শারীফাইন'। তাদের কর্তব্য, এই খিদমতের মর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি করা এবং একে এক মহা আমানত ও গুরুভার দায়িত্ব বিবেচনা করা। এই বোধ ও উপলব্ধি তাদেরকে এই আমানত রক্ষায় পার্থিব পদ-পদবি, প্রাণ ও সম্পদের চ্যালেঞ্জ হাসিমুখে বরণ করতে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, বর্তমান সৌদি আরবে এমন কিছু বিষয় ঘটতে দেখা যাচ্ছে, যা কিছুতেই হারামাইনের খিদমতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আল্লাহর দ্বীনের নুসরতের পথে দৃঢ়পদে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে জাহিলিয়াতের কাছে আত্মসমর্পণ হবে খোদ দায়িত্বশীলদের জন্যেই চরম আত্মঘাতী।

এই প্রেক্ষাপটে আরবের বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং এই ভূখণ্ডের নেতৃত্ব ও নাগরিকদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে এই উপমহাদেশের একজন দায়ী ইলাল্লাহ হযরত মাওলানা সায়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদাভী রাহ.-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী কিছু আলোচনা আলকাউসারের পাঠকদের জন্য উপস্থাপিত হচ্ছে। এখানে রয়েছে একটি প্রবন্ধ, একটি বক্তৃতা ও একটি চিঠি।

প্রবন্ধটি তাঁর বিখ্যাত 'মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমীন' গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ। পরবর্তীতে এটি

كيف يستعيد العرب مكانتهم اللائقة بهم، وكيف يحافظون عليها؟

নামে আলাদা রিসালারূপেও প্রকাশিত হয়েছে। আমরা প্রবন্ধটি গ্রহণ করেছি মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুম অনূদিত 'মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হল' গ্রন্থ থেকে।

'বস্তুবাদী সভ্যতা:এক মর্দে মুমিনের দৃষ্টিতে' শীর্ষক নিবন্ধটি

نظرة مؤمن داع إلى المدنيات المعاصرة الزائفة

শীর্ষক রিসালার অনুবাদ। ৩ মুহাররম ১৩৯৭ হিজরী (২৩-১২-১৯৭৬ ঈ.) আবুধাবীর এক সুধী সম্মেলনে হযরত মাওলানা এই বক্তৃতাটি করেছিলেন। পরে তা আলমাজমাউল ইসলামী আলইলমী থেকে পুস্তিকারূপে প্রকাশিত হয়।

আর 'হিজাযের মর্যাদা, স্বাতন্ত্র্য ও তা রক্ষার অপরিহার্যতা' শিরোনামে উপস্থাপিত হয়েছে হযরত মাওলানা রাহ.-এর একটি চিঠি, যা তিনি ১৩৮১ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে তৎকালীন যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী আমীর ফয়সাল বিন আব্দুল আযীযের উদ্দেশে লিখেছিলেন। পত্রটি ড. শামস তিবরীয খান অনূদিত 'হিজাযে মুকাদ্দাস আওর জাযীরাতুল আরব : উমীদোঁ আওর আনদেশোঁ কে দরমিয়ান' গ্রন্থ থেকে তরজমা করা হয়েছে।

এই সংক্ষিপ্ত আয়োজনে আমরা পেতে পারি একজন ঈমানদারের চিন্তা ও দৃষ্টি। আপন আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে মুমিনের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, কেমন হবে ভোগবাদী ও বস্তুবাদী সভ্যতা সম্পর্কে তার মূল্যায়ন– এখানে তার নির্দেশনা রয়েছে। তেমনি উপমহাদেশের দায়ী ইলাল্লাহগণ জাযীরাতুল আরবকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন এবং ঐ ভূখণ্ডের কর্ণধারদের সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার কী গভীর প্রত্যাশা পোষণ করেন, শুধু প্রত্যাশাই নয়, বাস্তব কর্মক্ষেত্রেও তাদের কর্ম ও তৎপরতা কীরূপ ছিল এরও একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন এবং সকলকে ঈমান ও আমলের পথে এগিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করুন– আমীন। –উপস্থাপক]

১

প্রবন্ধ

আরবজাতি কীভাবে ফিরে পাবে তার মর্যাদা

বিশ্বের চোখে আরববিশ্বের গুরুত্ব

বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে আরবভূখণ্ডের গুরুত্ব অপরিসীম। শুরু থেকেই তা ঐসব জাতি ও জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল, যারা মানবজাতির ইতিহাসে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া তার বুকে রয়েছে সম্পদ ও শক্তির সুবিশাল ভাণ্ডার– জ্বালানী তেল, লোভাতুর পশ্চিমা বিশ্ব যার নাম দিয়েছে 'তরল স্বর্ণ'। শিল্প ও যুদ্ধকে যদি একটি শরীর কল্পনা করি তাহলে তেল হচ্ছে সেই শরীরের জন্য প্রবহমান রক্ত, (যার জন্য বিভিন্ন নামে পশ্চিমাদের হাতে লাগাতার ঝরছে আরবদের এত রক্ত)। তদুপরি আমাদের আরবভূখণ্ড হচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকা ও দূরপ্রাচ্যের মাঝে সংযোগস্থল। সর্বোপরি আরব হচ্ছে ইসলামী বিশ্বের স্পন্দিত হৃদপিণ্ড। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কারণে পুরো মুসলিমবিশ্বের অভিমুখ আরবের দিকে। প্রতিটি মুসলিম হৃদয় আরবের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার বন্ধনে আবদ্ধ।

সম্প্রতি বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে আরবভূখণ্ডের গুরুত্ব আরো বেড়ে যাচ্ছে একারণে যে, আল্লাহ না করুন হয়ত এটাই হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র। তাই পশ্চিমা সমরবিশেষজ্ঞরা নতুন করে আরববিশ্বের মানচিত্র নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন। সেখানে রয়েছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা ও প্রতিভা; রয়েছে চিন্তার উপযোগী সক্রিয় বুদ্ধি এবং যুদ্ধের উপযোগী মযবূত শরীর; রয়েছে দক্ষ জনবল ও কর্মীর হাত; রয়েছে বড় বড় বাজার ও বাণিজ্যকেন্দ্র এবং রয়েছে কৃষি-উপযোগী প্রচুর ভূমি।

সেখানে রয়েছে 'সৌভাগ্যের প্রতীক' নীলনদ এবং নীলনদের দেশ মিশর, যা উর্বরতায়, সম্পদে, শস্যপ্রাচুর্যে, সর্বোপরি বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি ও নাগরিক সভ্যতার সমৃদ্ধিতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী। আরো রয়েছে সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও প্রতিবেশী বিস্তীর্ণাঞ্চল, যার আবহাওয়া ও জলবায়ু অতি মনোরম ও স্বাস্থ্যপ্রদ। প্রকৃতি সেখানেই তার অপার সৌন্দর্য যেন অকৃপণভাবে ঢেলে দিয়েছে। সর্বোপরি এ অঞ্চল আলাদা সামরিক কৌশলগত গুরুত্বেরও অধিকারী।

সেখানে রয়েছে সভ্যতার লালনভূমি ইরাক, দজলা-ফোরাতের সুবাদে আদিকাল থেকেই যাকে বলা হয় দুই নদীর দেশ, بلاد الرافدين যা শৌর্য-সাহস, অদম্য মনোবল ও কষ্টসহিষ্ণুতার কারণে, সেই সঙ্গে বর্তমানে বস্তুসভ্যতার প্রাণ তেল-সম্পদের কারণে প্রসিদ্ধ।

সর্বোপরি আরবভূখণ্ডেই রয়েছে মক্কা, মদীনা, হিজায ও জাযীরাতুল আরব; মুসলিম উম্মাহর আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসাবে যা অপরিসীম দ্বীনী মর্যাদা ও ধর্মীয় প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী। সেখানে পবিত্র ভূমিতে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় ইসলামের অন্যতম প্রধান ইবাদত হজ্জ। তাতে ঘটে সারা পৃথিবী থেকে আগত লাখ লাখ মানুষের ভাবগম্ভীর আধ্যাত্মিক সমাবেশ, সারা বিশ্বে যার কোন তুলনা নেই। তেল

সম্পদের বিপুল মজুদের কথা এখানে না হয় না-ই বলা হলো।

এসকল বহুমুখী গুণ, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বের কারণে বহুকাল ধরে আরববিশ্ব হয়ে আছে পশ্চিমাদের আগ্রহ ও মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু, লোভ-লালসার ক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বসঙ্ঘাতের উত্তপ্ত ভূমি। এর প্রতিক্রিয়ারূপে আরবজাতির মধ্যে যেখানে জেগে ওঠার কথা ছিলো ঈমানী গায়রত ও ইসলামী চেতনার জোয়ার; আফসোস, তার পরিবর্তে আজ সমগ্র আরববিশ্বে জেগে উঠেছে আরবজাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপূজার সুতীব্র অনুভূতি ও আন্দোলন।

আল্লাহর রাসূল মুহম্মদ আরবজাতির প্রাণ

কিন্তু একজন মুসলিম আরববিশ্ব ও আরবজাতির প্রতি সেই দৃষ্টিতে তাকায় না, যে দৃষ্টিতে তাকায় ইউরোপ, আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের জাতিবর্গ। এমনকি আরবের প্রতি কোন জাতীয়তাবাদী আরবের যে দৃষ্টি, একজন মুসলিমের দৃষ্টি তা থেকেও সম্পূর্ণ ভিন্ন। একজন মুসলিমের দৃষ্টিতে আরবের পবিত্র ভূমি হচ্ছে ইসলামের দোলনা ও প্রতিপালনভূমি, ইসলামের নূর-মিনার এবং মানবতার রক্ষাদুর্গ। জাযীরাতুল আরব হচ্ছে বিশ্বনেতৃত্বের কেন্দ্রভূমি। মুসলিম বিশ্বাস করে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হচ্ছেন আরবজাতির প্রাণ, অস্তিত্বের ভিত্তি এবং তার গৌরব ও মর্যাদার শিরোনাম। আরববিশ্ব আজ যত সম্পদ, তেলক্ষেত্র, সোনার খনি এবং যত গুণ-বৈশিষ্ট্য ও কল্যাণের অধিকারী, তার সঙ্গে যদি আরো কয়েকগুণ যুক্ত হয়, আর আল্লাহ না করুন সাইয়েদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে তার পরিচয়সূত্র ছিন্ন হয়ে যায়, তাঁর দ্বীন ও শরীআত, তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ থেকে যদি তারা বিচ্যুত হয়ে পড়ে তাহলে আরবজাতি হবে প্রাণহীন এক দেহ এবং মরুভূমির বালুতে আঁকা অস্পষ্ট রেখা। এককথায় বিশ্বের মানব-মঞ্চ থেকে আরবজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে তখন খুব বেশী সময় লাগবে না।

আল্লাহর নবী এই মুহম্মদে আরাবীই তো তাদের জাতীয় সত্তার অস্তিত্ব দান করেছেন। তাঁর পূর্বে তো এই ভূখণ্ড ছিলো শতখণ্ডে খণ্ডিত অখ্যাত, অজ্ঞাত, উপেক্ষিত ও অবহেলিত দেশ। সেখানে ছিলো পরস্পর দ্বন্দ্ব-বিবাদ; খুনাখুনি ও রক্তপাতে লিপ্ত বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্র। মেধা, যোগ্যতা ও প্রতিভা যা কিছু ছিলো, অপচয় হচ্ছিলো, কিংবা অক্ষেত্রে ব্যয় হচ্ছিলো। অজ্ঞতা, মূর্খতা, ভ্রষ্টতা ও গোমরাহির অন্ধকারে সারা দেশ ডুবে ছিলো।

অহমিকা, আত্মম্ভরিতা ও জাত্যাভিমান ছিলো তাদের প্রচণ্ড, কিন্তু রোম ও পারস্যের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার কথা স্বপ্নেও তারা ভাবতে পারতো না। এমন কথা কেউ যদি তাদের কানে দিতো তাহলেও কোন অবস্থাতেই তারা তা বিশ্বাস করতে পারতো না। আরববিশ্বের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ শাম ও সিরিয়া ছিলো রোম সাম্রাজ্যের 'উপনিবেশ', যা রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারী শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিলো। ন্যায়, সাম্য, সুবিচার ও স্বাধীনতার কোন অর্থই তাদের জানা ছিলো না।

অন্যদিকে ইরাক ছিলো কায়ানি শাসনের ভোগ-চাহিদা ও লোভলালসার শিকারভূমি। বিভিন্ন নামে আরোপিত নিত্যনতুন শুল্ক ও করের বোঝায় তারা ছিলো বিপর্যস্ত। মিশর ছিলো রোমান সাম্রাজ্যের বাহন-উট ও দুধের উটনী। পিঠে চড়তো, দুধ খেতো, কিন্তু পর্যাপ্ত ঘাস দিতো না। তদুপরি ছিলো রাজনৈতিক যুলুম-অবিচার এবং ধর্মীয় নিপীড়ন-নির্যাতন।

ছিন্নভিন্ন, বিপর্যস্ত ও বিভিন্ন নিপীড়ন-নির্যাতনের এই ভূখণ্ডে হঠাৎ ইসলামের সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হলো। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন, গোটা আরব বিনাশ ও ধ্বংস এবং হালাকত ও বরবাদির দোরগোড়ায় চলে গিয়েছে। তিনি হাত ধরে সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের নতুন জীবন দান করলেন। নূর দান করলেন, যার উজ্জ্বলতায় তারা মানবসমাজে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে। তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিলেন এবং তাযকিয়া ও আত্মসংশোধনের দীক্ষা দিলেন। এভাবে মুহম্মদী নবুয়তের পর আরবজাতির প্রকৃতি বদলে গেলো। এখন তারা বিশ্বের জন্য ইসলামের সফীর ও প্রতিনিধি এবং শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তাবাহী। তাহযীব ও তামাদ্দুন এবং নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পতাকাবাহী। সারা বিশ্বের জন্য এখন তারা সাম্য, শান্তি, কল্যাণ ও করুণার অগ্রদূত। এভাবে শাম, ইরাক ও মিশর নতুন পরিচয় লাভ করলো এবং আরবজাতি নতুন জাতীয় সত্তায় আত্মপ্রকাশ করলো।

আল্লাহর রাসূল যদি না হতেন, তাঁর দাওয়াত, রিসালাত ও মিল্লাত যদি না হতো, কোথায় থাকতো আজ শাম, ইরাক ও মিশর? কোথায় থাকতো আজকের এ অনন্য মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী আরব জাহান ও আরবজাতি? কোন কিছুর অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেতো না। শুধু তাই নয়, পৃথিবীও কখনো সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম ও নৈতিকতা এবং উন্নতি ও অগ্রগতির বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছতে পারতো না।

উপরে যা বলা হলো, কসম করে বলো হে আরব, তা কি সত্য নয়? যদি সত্য হয় তাহলে বলবো, আরবের কোন সরকার বা জনগোষ্ঠী যদি দ্বীনুল ইসলামকে পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্যের সঙ্গে, কিংবা ইসলামপূর্ব আরব জাহেলিয়াতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, যদি তারা জীবন ও জীবনব্যবস্থা থেকে শরীয়তে মুহম্মদীর আহকাম ও বিধান সরিয়ে পাশ্চাত্যের জীবনব্যবস্থা ও জীবনদর্শন গ্রহণ করতে চায়, কিংবা আরবজাতীয়তাবাদের বুনিয়াদের উপর নিজেদের ভবিষ্যত তৈরি করতে চায়, যদি কেউ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইমাম ও উসওয়াতুন হাসানাহ এবং নেতা ও আদর্শরূপে গ্রহণ করতে না চায় তাহলে এই মুহূর্তে তারা মুহম্মদ বিন আব্দুল্লাহর সমস্ত দান, অবদান, দয়া ও অনুগ্রহ যেন ফিরিয়ে দেয় এবং প্রাচীন জাহেলিয়াতের অবস্থায় ফিরে যায়, যেখানে আছে শুধু গোত্রীয় যুদ্ধ ও গৃহবিবাদ, রোম ও পারস্যের যুলুম-অবিচার, দাসত্ব-লাঞ্ছনা এবং ক্ষুধা-অনাহারের অভিশাপ; যেখানে আছে শুধু পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, শিক্ষা ও সভ্যতার ছায়া থেকে বঞ্চিত অখ্যাত, অজ্ঞাত ও অন্ধকার এক জীবন।

এই যে তোমাদের গৌরবময় ইতিহাস, আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা, এই সুসমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্য, এই আরব সালতানাত, এত রাজ্য ও রাজত্ব, এসব তো মুহম্মদী নবুয়তেরই দয়া ও দান, ফয়য ও ফয়যান, এ তো তাঁরই শুভাগমনের কল্যাণ-অবদান!

আরবজাতির শক্তির উৎস ঈমান

ইসলামই হচ্ছে আরব জাহানের পরিচয় ও জাতীয়তা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আরবজাতির ইমাম, নবী ও পথপ্রদর্শক। আর ঈমানই হচ্ছে আরবজাতির শক্তির উৎস। এ শক্তিবলেই জাগতিক শক্তিতে দুর্বল হয়েও তারা সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছে। অতীতে যেমন ছিলো, আজো তেমনি ঈমানই আরবজাতির অস্ত্র ও শক্তি। এ শক্তিবলেই সে পারে শত্রুকে পরাস্ত করতে এবং নিজের অস্তিত্বকে সুরক্ষা দিতে এবং পারে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব; রিসালাতের দাওয়াত ও পয়গাম

নিয়ে বিশ্বের সামনে দাঁড়াতে। আরবজাতি ইহুদীবাদ বা অন্য শক্তির বিরুদ্ধে, ইউরোপ-আমেরিকা ও রাশিয়ার দেয়া অস্ত্র দিয়ে– যার মাধ্যমে তারা আরবদের অর্থ শোষণ ও তেল লুণ্ঠন করছে– এসব অস্ত্র দিয়ে তারা কারো বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারবে না; যুদ্ধ জয় করা তো দূরের কথা। তারা জয়ী হতে পারবে শুধু ঈমান ও আত্মিক শক্তি দ্বারা এবং প্রাণপ্রেরণা ও উদ্যম-উদ্দীপনা দ্বারা, যার বলে বলীয়ান হয়ে একদিন তারা রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছিলো এবং জয়ী হয়েছিলো।

আজ আমরা আরবজাতির অবস্থা কী দেখতে পাই! জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যুর ভয়, ভোগ ও আরাম-আয়েশের লোভ, অবিশ্বাস ও দ্বিধা-সংশয় এবং চিন্তার দ্বন্দ্ব; এ অবস্থায় আর যাই হোক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না। সুতরাং আরববিশ্বের সরকার ও নেতৃবৃন্দ এবং আরবলীগের নীতিনির্ধারকদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো শ্রেণী ও স্তরনির্বিশেষে গোটা জাতির অন্তরে এবং আরব ফৌজের, সিপাহী ও সিপাহসালার সবার দিলে ঈমানের বীজ বপন করা, জিহাদের প্রেরণা, শাহাদাত ও জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা।

আরবজাতির বিশিষ্ট-সাধারণ সর্বস্তরের মানুষকে আজ এমন শিক্ষা ও দীক্ষা দান করতে হবে, যেন দুনিয়ার অন্তসারশূন্য চাকচিক্য ও জাঁকজমকের প্রতি তুচ্ছতা ও নির্মোহতা সৃষ্টি হয়; নাফসের খাহেশাত ও প্রবৃত্তির চাহিদা-লালসা এবং জীবনের মোহ-মায়ার উপর সংযম ও নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা সম্ভব হয়। শুধু কথা ও বাগ্মিতা দ্বারা নয়, বরং কর্ম ও আচরণ দ্বারা তাদের দেখাতে হবে, কীভাবে আল্লাহর রাস্তায় বিপদ-কষ্ট বরণ করতে হয় এবং কীভাবে আলো ও পতঙ্গের মত মৃত্যুতে ঝাঁপ দিতে হয় এবং মৃত্যুকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করতে হয়। তাদের দেহ-শিরায় যদি আল্লাহর তলোয়ার খালিদ বিন ওয়ালীদের রক্ত থাকে তাহলে তাঁর মত তাদেরও আজ বলতে হবে শত্রুর উদ্দেশ্যে, 'আগামীকাল এমন কাউমের সঙ্গে হবে তোমাদের মোকাবেলা, মৃত্যু যাদের কাছে তেমনই প্রিয় যেমন প্রিয় তোমাদের কাছে মদের পেয়ালা।'

আরবযুবশক্তির আত্মত্যাগ ও মানবতার মুক্তি

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয় ঠিক ঐ সময় যখন মানবতার দুর্গতি ও দুর্ভাগ্য এমন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো, যারপর আর কোন সীমা নেই। সেখান থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করা এবং মুক্তি ও সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করা তাদের সাধ ও সাধ্যের বাইরে ছিলো, যারা প্রাচুর্যের কোলে প্রতিপালিত হয়েছে এবং যাদের জীবন ও যৌবন ছিলো খাহেশাত ও ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত, যাদের বর্তমান ছিলো আনন্দ-বিনোদনের আয়োজনে ভরপুর এবং ভবিষ্যত ছিলো নিশ্চিন্ত নিরাপদ। ছায়াঘেরা জীবন থেকে বের হয়ে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-দুর্যোগের সম্মুখীন হওয়া এবং জানমালের কোরবানি দেয়ার যোগ্যতা তাদের ছিলো না। এজন্য প্রয়োজন ছিলো এমন জাতি ও জনগোষ্ঠীর, মুমূর্ষু মানবতার মুক্তির মহান দায়িত্ব পালনের জন্য যারা জীবন, যৌবন ও ভবিষ্যত বিসর্জন দিতে পারে; পারে যে কোন বিপদ-দুর্যোগের মধ্যে হাসিমুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে। না জানমালের পরোয়া আছে, না পেশা, ব্যবসা ও জীবিকার দুয়ার বন্ধ হওয়ার দুশ্চিন্তা আছে, না মা-বাবা পরিবার ও বন্ধু-স্বজনের আশাহত হওয়ার অনুতাপ আছে। যেমন কাউমে ছালেহ বলেছিলো–

يَٰصَٰلِحُ قَدۡ كُنتَ فِينَا مَرۡجُوّٗا قَبۡلَ هَٰذَآ

হে ছালেহ, এর আগে তো আমাদের মধ্যে তুমি সম্ভাবনাময় ছিলে (কোত্থেকে কী হলো, এমন উন্মাদনা পেয়ে বসলো যে, আমাদের সব আশা, সব সম্ভাবনা মাটি হয়ে গেলো।) –সূরা হূদ (১১) : ৬২

কিন্তু যারা আগে বাড়ে, তাদের অন্তরে এসব চিন্তা ও দুশ্চিন্তা কিছুই থাকে না। থাকে শুধু মানবতার প্রতি দরদ-ব্যথা এবং মানবতার মুক্তির ব্যাকুলতা।

'জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য'করা এমন মুজাহিদীনের জামাত ছাড়া মানবতার উদ্ধার ও অস্তিত্ব রক্ষার আশা কিছুতেই করা যায় না এবং কোন মহান দাওয়াত ও আন্দোলনের সফলতার কথা চিন্তাও করা যায় না। হাতে গোনা এমন কিছু মানুষের– সময় ও সমাজের চোখে যারা বোকা ও দুর্ভাগা– হ্যাঁ, তাদেরই 'দুর্গতি ও দুর্ভাগ্যের' মূল্যেই মানবতা লাভ করে নবজীবন, মানবজাতির ঘটে নব-উত্থান; জীবন ও সভ্যতার গতি পরিবর্তিত হয় অন্ধকার থেকে আলো এবং অকল্যাণ থেকে কল্যাণের দিকে।

যদি কিছু মানুষের ত্যাগ ও আত্মত্যাগ, বঞ্চনা ও দুর্ভোগ এবং বৈষয়িক ও ব্যবসায়িক ক্ষতি পুরো উম্মাহর জন্য সফলতা ও সৌভাগ্য বয়ে আনে এবং লাখো মানুষ, যাদের সংখ্যা-শুমার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না, যদি তারা আল্লাহর আযাব ও জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত পেয়ে যায় তাহলে বলতেই হবে, ঐ 'বঞ্চিত ও দুর্ভাগারাই' সার্থক, তাদেরই জীবন ধন্য। পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো একজন মাত্র মানুষের হিদায়াত সম্পর্কে বলেছেন–

لأن يهدي الله بك رجلا خير من حمر النعم

আল্লাহ তোমার মাধ্যমে একজন মানুষকে হিদায়াত দান করবেন, এটা (আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ) লাল বর্ণের উটদলের চেয়ে উত্তম।

আর এখানে তো প্রশ্ন হলো মানুষ, মানবতা ও গোটা মানবজাতির!

নবুয়তে মুহম্মদীর 'তাশরীফায়নে'র সময় আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই জানতেন, রোম ও পারস্য এবং পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতি, যাদের হাতে তখন বিশ্বের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ছিলো, ভোগসর্বস্ব জীবন ও বস্তুবাদী স্বভাবের কারণে দাওয়াত ও জিহাদ এবং বিপন্ন মানবতার উদ্ধার-প্রচেষ্টায় কঠিন প্রতিকূলতা ও বিপদ-দুর্যোগের ঝুঁকি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবে না। এমনকি জীবনের সামান্য আরাম-আয়েশ, সাধারণ সাজসজ্জা ও সাধ-আহ্লাদও কিছুমাত্র ত্যাগ করার যোগ্যতা তাদের নেই। সেখানে অল্পসংখ্যায়ও এমন মানুষ ছিলো না, যারা খাহেশাত ও লোভ-লালসা দমন করতে এবং নাগরিক জীবনের অপ্রয়োজনীয় 'কেতাদুরস্তি' ছেড়ে 'কাফাফ'-এর জীবনে খুশী হতে পারে।

তাই ইসলামের পায়গাম ও নবীর ছোহবতের জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন জাতিকেই মনোনীত করেছেন, যারা দাওয়াত ও জিহাদের গুরুভার বহন করতে পারে এবং ত্যাগ ও কোরবানির পথে চলতে পারে। তারা ছিলো আরবজাতি, সুস্থ-সবল, শক্ত-সুঠাম, সভ্যতার যাবতীয় দোষ-উপসর্গ থেকে মুক্ত। কারণ সে যুগের 'পচনধরা' নগরসভ্যতার ছোঁয়া-ছায়া থেকে তারা ছিলো নিরাপদ দূরত্বে। তাদের মধ্য হতেও আল্লাহ তা'আলার নির্বাচিত ব্যক্তিগণ হলেন নবীর ছাহাবা, হৃদয়ের পুণ্যতায়, জ্ঞানের গভীরতায় এবং জীবনের অনাড়ম্বরতায় মানুষের সমাজে তাঁরা ছিলেন সবার উপরে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত নিয়ে সেই যে ছাফা পাহাড়ে দাঁড়ালেন এবং নেমে এলেন, তারপর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিলেন। এসময় তিনি চেষ্টা-সাধনা ও মেহনত-মুজাহাদার পুরা হক আদায় করেছেন। দাওয়াতের কাজকে তিনি এমন সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, যা দাওয়াতের পথে বাধা হতে পারে। দুনিয়ার যাবতীয় লোভ

ও চাহিদা থেকে তিনি সম্পূর্ণ বেঁচে ছিলেন এবং এ বিষয়ে সমগ্র বিশ্বের জন্য ইমাম ও উসওয়া এবং আদর্শ মানদণ্ড ছিলেন।

সীরাতের প্রসিদ্ধ ঘটনা, দাওয়াত থেকে বিরত থাকার প্ররোচনারূপে কোরায়শ একবার এমন কিছু প্রস্তাব দিলো, যার হাতছানি এড়িয়ে যাওয়া খাহেশাতের আভাসমাত্র রয়েছে এমন কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না; তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। আর প্রিয় চাচা যখন আগের মত 'ছায়া' দিতে একটু দ্বিধা প্রকাশ করলেন তখন তিনি যা বললেন, তা ছিলো দাওয়াতের প্রতি আত্মনিবেদনের ইতিহাসে তুলনাহীন। তিনি বললেন–

يا عم! والله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر، حتى يظهره الله، أو أهلِكَ فيه، ما تركته.

হে চাচা! আল্লাহর কসম, এরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে রাখে তবু একাজ থেকে আমি পিছু হটবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ এটাকে বিজয়ী করেন, কিংবা এ পথে আমি শেষ হয়ে যাই।

দাওয়াতের জন্য ত্যাগ ও আত্মত্যাগ এবং সর্বস্ব বিসর্জনের এ ঘটনা শুধু ঘটনা ছিলো না, বরং নবী-যুগ ও পরবর্তী যুগের সমস্ত 'আহলে দাওয়াত'-এর জন্য ছিলো চিরস্থায়ী আদর্শ। এক্ষেত্রে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের জন্য তিনি আরাম-আয়েশের সমস্ত পথ বন্ধ করে রেখেছিলেন। শুধু নিজের জন্য কেন? পরিবার পরিজন ও সমস্ত নিকটজনকেও তিনি 'দুনিয়া' থেকে দূরে রেখেছেন। তাই আত্মীয়তায় যিনি যত নিকটের ছিলেন, জীবনের সুবিধাভোগের ক্ষেত্রে তিনি তত পিছনে ছিলেন, কিন্তু ত্যাগ ও কোরবানির ক্ষেত্রে ছিলেন তত অগ্রভাগে। যখন কোন কিছু হারাম ও নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপ নিতেন, আল্লাহর রাসূল আপন গোত্র, পরিবার ও ঘর থেকে তা শুরু করতেন, আর যখন কোন হক ও সুবিধা ঘোষণা করতেন তখন অন্যদের এগিয়ে রাখতেন; এমনকি কখনো নিকটতম আত্মীয়দের উপর তা হারামও করে দিতেন।

যখন 'সুদ' হারাম করার ইচ্ছা করলেন তখন চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবকে দিয়ে শুরু করলেন এবং সর্বপ্রথম তার পাওনা সুদ রহিত করলেন। যখন জাহেলিয়াতের 'প্রতিশোধপ্রথা' বাতিল করার ইচ্ছা করলেন তখন রাবী'আ ইবনুল হারিছ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের 'রক্ত' দিয়ে শুরু করলেন এবং সর্বপ্রথম তার রক্তের প্রতিশোধ-অধিকার বাতিল ঘোষণা করলেন।

পক্ষান্তরে যখন যাকাতের বিধান প্রবর্তন করলেন, যা ছিলো 'চিরঅব্যাহত' একটি বিরাট অর্থনৈতিক সুবিধা, তিনি তা চিরকালের জন্য তার নিকটতম স্বজন বনুহাশিমের উপর হারাম করে দিলেন। তাদের ধনীরা যাকাত দেবে, কিন্তু তাদের গরীবরা যাকাত পাবে না।

মক্কাবিজয়ের দিন আলী বিন আবু তালিব রা. আবদার জানালেন, যেন বনু-হাশিমের অনুকূলে 'সিকায়া' এবং 'হিজাবাহ'-এর দায়িত্বও যুক্ত করা হয়, কিন্তু তিনি তা না-মঞ্জুর করে (তখন পর্যন্ত অমুসলিম) উছমান বিন তালহাকে ডাকালেন এবং কা'বার চাবি তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন–

هاك مفتاحك يا عثمان! اليوم يوم بر ووفاء وقال : خذوها خالدة تالدة فيكم لا ينزعها منكم إلا ظالم.

হে উছমান, তোমার চাবি নাও। আজ অনুগ্রহের ও বিশ্বস্ততা রক্ষার দিন। নাও, চিরকাল, লাগাতার এটা তোমাদের মধ্যে থাকবে, যালিম ছাড়া কেউ তোমাদের থেকে তা ছিনিয়ে নেবে না।

স্ত্রীগণকে তিনি যুহদ ও নির্মোহতা, কানা'আত ও অল্পেতুষ্টি এবং 'শুকনো রুক্ষ' জীবন যাপনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন, যদি তোমরা অভাব অনটনের জীবনে সন্তুষ্ট থাকো তাহলে আমার সঙ্গে থাকো; আর যদি আরাম আয়েশের জীবন পছন্দ করো তাহলে ভিন্ন পথ গ্রহণ করো। তিনি তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা শুনিয়ে দিলেন–

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا وَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا.

হে নবী, বলুন আপনার স্ত্রীগণকে, যদি তোমরা চাও দুনিয়ার জীবন এবং তার সৌন্দর্যশোভা, তাহলে এসো, তোমাদের আমি ভোগ করাবো এবং সুন্দরভাবে বন্ধনমুক্ত করে দেবো। আর যদি চাও তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে এবং আখেরাতের বাসস্থানকে, তাহলে আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন তোমাদের মধ্য হতে যারা পুণ্যবতী তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান। –সূরা আহযাব (৩৩) : ২৮-২৯

তবে তাঁর 'পুণ্যবতী' স্ত্রীগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই গ্রহণ করেছিলেন।

নবীকন্যা হযরত ফাতেমা রা. অবগত হলেন, তাঁর কাছে কিছু গোলাম ও খাদেম এসেছে। এদিকে আটা পেষার যাঁতাকল চালাতে চালাতে তাঁর হাতে 'যখম' পড়ে গিয়েছিলো। তিনি প্রিয় পিতার নিকট গেলেন এবং একজন খাদেমের আবদার জানালেন, কিন্তু তিনি বললেন, তুমি যা চেয়েছো আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস বাতাবো না? শয্যাগ্রহণের সময় চৌত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' বলো, তেত্রিশবার 'আলহামদুল্লিাহ' বলো এবং তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ' বলো। এটা তোমাদের জন্য তোমাদের চাওয়া জিনিস থেকে উত্তম।

মোটকথা, এটাই ছিলো আহলে বাইত ও নিকটজনদের ক্ষেত্রে তাঁর আচরণ ও অনুসৃত নীতি। যিনি যত নিকটজন তার সুবিধা তত সঙ্কুচিত, আর দায়দায়িত্ব সম্প্রসারিত। পৃথিবীর কোন সভ্যজাতির কোন কর্ণধার এর ন্যূনতম নমুনাও যদি দেখাতে পারতো!

হ্যাঁ, পেরেছিলেন তাঁর প্রিয়তম পাত্র, উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি খলিফা হযরত আবু বকর রা.; পেরেছিলেন তাঁকে অনুসরণ করতে। তাঁর স্ত্রী যখন কিছু দিনের খরচ বাঁচিয়ে একটু মিষ্টান্ন তৈরি করলেন, তখন ছিদ্দীকে আকবর বাইতুল মালের যিম্মাদারকে জানালেন, এখন থেকে আবু বকরের ভাতা যেন এই পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হয়। কারণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আবু বকরের পরিবার আরো কম খরচে চলতে পারে!

পেরেছিলেন হযরত ওমর, উছমান, আলী, হাসান, হোসায়ন এবং ছাহাবায়ে কেরাম, রিযওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলাই-হিম আজমা'ঈন।

মক্কার কিছু মানুষ যখন ঈমান আনলেন তখন তাদের অর্থনৈতিক জীবন তছনছ হয়ে গেলো। বাজারের অসহযোগিতার কারণে এবং দাওয়াতি কাজের ব্যস্ততার কারণে তাঁদের ব্যবসা বসে গেলো। কারো কারো সারা জীবনের সঞ্চিত পুঁজি হাতছাড়া হয়ে গেলো। তাঁদের মধ্যে এমনো ছিলেন, যাদের বিলাস-ব্যসন, পোশাক-জৌলুস ও প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন ছিলো প্রবাদতুল্য, কিন্তু সবকিছু এমনভাবে শেষ হলো যে, তাঁদের জীর্ণ-মলিন বাস দেখে সকলে হয়রান। অনেকে শুধু ঈমান আনার অপরাধে পৈতৃক সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হলেন। (কিন্তু পরবর্তীতে এজন্য তারা বিশেষ কোন সুবিধা লাভ করেননি।)

তারপর আল্লাহর রাসূল যখন মদীনায় হিজরত করলেন এবং আনছার তাঁর সঙ্গ

গ্রহণ করলেন, তখন (ঈমানী, আমলী, দাওয়াতি ও জিহাদি ব্যস্ততার কারণে) তাদের কৃষিকাজ ও বাগান পরিচর্যা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং তাঁদের আর্থিক অবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব পড়লো। শেষে তাঁরা খামার ও বাগান পরিচর্যার জন্য কিছু সময় প্রার্থনা করলেন, কিন্তু তা নাকচ করে দিলেন, আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সতর্ক করে আয়াত নাযিল করলেন–

وَ اَنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ لَا تُلْقُوْا بِاَیْدِیْكُمْ اِلَی التَّهْلُكَةِ وَ اَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ.

আর তোমরা খরচ করো আল্লাহর রাস্তায়, আর নিজেকে নিক্ষেপ করো না বরবাদির দিকে। আর সদাচার করো, নিশ্চয় আল্লাহ সদাচারকারীদের ভালোবাসেন। –সূরা বাকারাহ (২) : ১৯৫

একই রকম ছিলো (সাধারণ) আরবদের অবস্থা, যারা দাওয়াত গ্রহণ করেছেন এবং দাওয়াতি আমলে ও জিহাদ-মুজাহাদায় শামিল হয়েছেন। বস্তুত জানমালের কোরবানিতে এবং বিপদ-কষ্টের জীবনে পৃথিবীর অন্য যে কোন জাতির চেয়ে তারা অনেক বেশি অগ্রসর ছিলেন। আর তাদেরই সম্বোধন করে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِیْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَیْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِیْ سَبِیْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰی یَاْتِیَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَ اللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْنَ.

আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা এবং তোমাদের পুত্র এবং তোমাদের ভাই এবং তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের পরিবার-স্বজন এবং সম্পদ, যা তোমরা সঞ্চয় করেছো এবং ব্যবসা, যা মন্দাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করো এবং আবাসস্থল, যেগুলো তোমাদের খুব পছন্দের, যদি এগুলো তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে তাহলে অপেক্ষা করো আল্লাহ্ তাঁর (আযাবের) ফায়সালা পাঠানো পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক কাউমকে পথ দেখান না। –সূরা তাওবা (৯) : ২৪

আরো ইরশাদ হয়েছে–

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِیْنَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ یَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَ لَا یَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ.

মদীনার বাসিন্দাদের এবং তাদের প্রতিবেশে বাসকারী বেদুঈনদের জন্য শোভন ছিলো না আল্লাহর রাসূলের সঙ্গ থেকে পিছিয়ে থাকা এবং তাঁর প্রাণের কথা ভুলে নিজেদের প্রাণ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়া। –সূরা তাওবা (৯) : ১২০

কারণ এই যে, মানবজাতির সৌভাগ্যের ইমারত তাঁদেরই কোরবানির বুনিয়াদের উপর কায়েম হওয়ার কথা ছিলো এবং অবস্থার পরিবর্তন ও নতুন বিপ্লবের আত্মপ্রকাশ শুধু এ অপেক্ষায় ছিল যে, 'মুহাজির-আনসার'-এর এই জামাত যেন ত্যাগ ও আত্মত্যাগ এবং মানবতার স্বার্থে যে কোনো বিপদ-দুর্যোগ বরণের সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাই তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِیْنَ.

আর অতিঅবশ্যই পরীক্ষা করবো আমি তোমাদেরকে কিছুটা ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং মালের, জানের ও ফলের ক্ষতি দ্বারা। আর সবরকারীদের আপনি সুসংবাদ দান করুন। –সূরা বাকারা (২) : ১৫৫

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে প্রশ্নের শৈলীতে বক্তব্যকে আরো জোরালো, আরো আবেদনপূর্ণ করে–

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ یُّتْرَكُوْۤا اَنْ یَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا یُفْتَنُوْنَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِیْنَ.

মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে, তারা 'ঈমান এনেছি' বলবে, আর তাদের ছেড়ে দেয়া হবে; তাদের কোনো পরীক্ষা নেয়া হবে না!? অথচ অবশ্যই আমি পরীক্ষা করেছি তাদের, যারা এদের পূর্বে বিগত হয়েছে। অবশ্যই আল্লাহ জেনে নেবেন ঐ লোকদের, যারা সত্য বলেছে, আর অবশ্যই জেনে নেবেন ঐ লোকদের, যারা মিথ্যা বলেছে। –সূরা আনকাবূত (২৯) : ২-৩

আরবজাতি যদি ত্যাগ ও আত্মত্যাগের এ সৌভাগ্য গ্রহণ করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতো বা পিছপা হতো, মানবতার দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্য আরো দীর্ঘায়িত হতো এবং জাহেলিয়াতের অন্ধকার পৃথিবীর উপর আরো বহুকাল ছেয়ে থাকতো। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِی الْاَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِیْرٌ.

যদি তোমরা তা না করো তাহলে যমীনে বড় ফেতনা দেখা দেবে এবং বড় ফাসাদ (সৃষ্টি হবে)। –সূরা আনফাল (৮) : ৭৩

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে পৃথিবী এক দো-মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন আরব-জাতির সামনে এবং তার ফলশ্রুতিতে মানবজাতির সামনে দুটো পথই খোলা ছিল। প্রথম পথ এই যে, আরবরা কোরবানির রাস্তায় এগিয়ে যাবে, জানমাল, সন্তান-সন্ততির কোরবানি এবং জীবনের প্রিয় সবকিছুর কোরবানি। দুনিয়ার তুচ্ছ লোভলালসা সংযত রাখবে এবং বৃহত্তর স্বার্থ ও কল্যাণের পথে ব্যক্তিস্বার্থ এবং ব্যক্তিগত সর্বস্ব বিসর্জন দেবে, তাহলে তা হবে মানবতার সৌভাগ্য এবং ইনসানিয়াতের খোশকিসমত। তখন দুনিয়াতেই বসবে জান্নাতের বাজার এবং যারা সৌভাগ্যবান, প্রাণের মূল্যে তারা ক্রয় করবে ঈমানের সম্ভার।

দ্বিতীয় পথ এই যে, বিশ্বের সংশোধন ও মানবজাতির কল্যাণের চিন্তা ছেড়ে তারা নিজেদের খাহেশাত ও চাহিদা, ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের চিন্তায় ডুবে থাকবে; তখন মানবজাতি পথহারা অবস্থায় দুর্ভাগ্যের চোরাবালিতেই আটকা পড়ে থাকবে এবং ধীরে ধীরে আরো তলিয়ে যেতে থাকবে। আর সেটা কতকাল, তা শুধু আল্লাহ জানেন।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির কল্যাণ, সৌভাগ্য ও মুক্তি চাইলেন, আর আরবজাতি, অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম পূর্ণ সাহস, উদ্দীপনা, ত্যাগ ও আত্মত্যাগের প্রেরণা এবং কোরবানির জোশ ও জযবা নিয়ে অগ্রসর হলেন। কেননা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের মধ্যে ঈমানের প্রেরণা এবং কোরবানির জোশ-উদ্দীপনা সঞ্চারিত করেছিলেন এবং দুনিয়ার 'ফানি যিন্দেগি'র মোকাবেলায় আখেরাতের আবাদী যিন্দেগানির হাকীকত তাঁদের বুঝিয়েছিলেন এবং জান্নাত ও তার অফুরন্ত নায-নেয়ামতকে তাঁদের সামনে অনেক প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিতরূপে তুলে ধরেছিলেন। তাই তাঁরা নিজেদের জানমাল ও জীবন যৌবনকে সমগ্র মানবতার জন্য মুক্তিপণরূপে পেশ করেছিলেন এবং মানবজাতির কল্যাণ ও সৌভাগ্যের জন্য দুনিয়ার লোভলালসা ও ভোগবিলাস বিসর্জন দিয়েছিলেন। এই জীবনে মানুষ যা কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে, যা কিছুর স্বপ্ন দেখে এবং যা কিছু আপন করে পেতে চায়– সব তাঁরা বিসর্জন দিয়েছিলেন এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ ও মুজাহাদা এবং মেহনত ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁদের জন্য কী ছিলো এর পুরস্কার? আলকোরআনের ভাষায়–

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْیَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ.

আর আল্লাহ তাদের দুনিয়ার বিনিময়

এবং আখেরাতের উত্তম বিনিময় দু'টোই দান করলেন। পুণ্যকর্মকারী ও নেককারদের তো আল্লাহ ভালবাসেন।
–সূরা আল মাইদাহ (৩) : ১৪৮

পৃথিবী এখন পিছনে সরতে সরতে ঠিক সেই বিন্দুতে ফিরে গেছে যেখানে খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ছিলো। মানবজাতি আরেকবার সেই দো-মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে মুহম্মদী নবুয়তের আবির্ভাবের সময় দাঁড়িয়ে ছিল। আরবজাতিকেই আজ আবার সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কী তারা করবে এবং কোন্ পথে চলবে। হয় তারা নবীর উম্মত হিসাবে এবং নবুয়তের সঙ্গে রক্ত-বন্ধনের দাবিতে ঈমান ও আমলের ময়দানে আবার আগে বাড়বে এবং পৃথিবীর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য, মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনার জন্য আবার বিপদ-দুর্যোগের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে; যিন্দেগীর আরাম-আয়েশ, জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভবিষ্যত উন্নতির সব সম্ভাবনা বিসর্জন দেবে, যাতে হোঁচটখাওয়া ও মুখ থুবড়ে-পড়া মানবতা আবার উঠে দাঁড়াতে পারে এবং পৃথিবীর আমূল চিত্রপরিবর্তন ঘটে।

কিংবা তারা এতদিন যেমন ছিলো, বদস্তুর তেমনই থেকে যাবে। সেই লোভ লালসা ও ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ, সেই পদ ও সম্পদের প্রতিযোগিতা, উন্নতি-পদোন্নতি, আয়-আমদানি ও লাভ-মুনাফার চিন্তা; সেই ভোগবিলাস ও আনন্দ বিনোদনে ডুবে থাকা। এককথায়, মানবতার দুর্গতির কথা না ভেবে মানব-জাতির মুক্তি ও কল্যাণের চিন্তা না করে, ভোগবাদী জীবনের অভ্যস্ত পথেই চলতে থাকা। তখন মানবতা এই গান্দাগলিয নর্দমায়ই পড়ে থাকবে যেখানে পড়ে আছে বহু শতাব্দী ধরে। কারণ মানবতার কল্যাণের আশা করাই বৃথা যদি আরবের অভিজাত যুবশক্তি বড় বড় শহরে, ইউরোপ-আমেরিকার বিনোদন-কেন্দ্রে খাহেশাত ও ভোগবিলাসে মজে থাকে; যদি তাদের জীবন-যৌবন বস্তুপূজা ও উদরপূজার মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে; যদি ব্যক্তিজীবনের উন্নতি ও প্রাচুর্যের চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তাই তাদের না থাকে।

আমাদের তো মনে হয়, জাহেলি যুগের কোনো কোনো যুবক আজকের আরব ও মুসলিম যুবকদের চেয়ে অনেক বেশি উচ্চ মনোবলের অধিকারী ছিল; চিন্তায় চেতনায় অনেক বেশি প্রসারিত ছিল। কারণ যে বিশ্বাস ও জীবনদর্শন তারা সত্য বলে গ্রহণ করেছিল তার জন্য তারা নিজেদের ভবিষ্যত বিসর্জন দিয়েছিল। এমনকি জাহেলিয়াতের কবি ইমরুউল কায়েসও হয়ত তাদের চেয়ে অনেক অভিজাত ছিলেন, যিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন–

ولو أنما أسعى لأدنى معيشة
كفانى ولم أطلب قليلا من المال
ولكنما أسعى لمجد مؤثل
وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي

যদি জীবনের সাধারণ জীবিকা-স্তরের জন্য সচেষ্ট হতাম, সামান্য অর্থই আমার জন্য যথেষ্ট হত, কিন্তু আমি তা চাইনি। আমি তো চাই এমন মর্যাদা, যার শিকড় অনেক গভীরে, আর আমার মত যুবকই পায় সুসংহত মর্যাদার নাগাল।

মানবতা ও মানবজাতিকে যদি শান্তি-সৌভাগ্যের সেই সবুজ দ্বীপে পৌছাতে হয় তাহলে নিজেদের কোরবানি ও আত্মত্যাগ দ্বারা মুসলিম যুবশক্তিকেই তৈরি করতে হবে 'মানবতার মুক্তির সেতু'। সেই সেতু পার হয়েই নিরাপদে পৌছা সম্ভব কল্যাণ ও মুক্তির সবুজ দ্বীপে।

উত্তম ফসলের জন্য ভূমির প্রয়োজন উত্তম সার। মানবতার ভূমিতে ইসলামের সবুজ ফসল ফলাতে হলেও প্রয়োজন উপযুক্ত সারের, আর তা হলো মুসলিম যুবকদের ব্যক্তিগত সমস্ত ইচ্ছা-চাহিদা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, জৌলুস-প্রাচুর্য এবং ভবিষ্যতের সমস্ত স্বপ্ন ও সম্ভাবনার বিসর্জন, যা তারা ইসলামের বিজয়, বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং মানুষকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য যুগে যুগে দিয়ে এসেছে। আরবযুবশক্তির এইটুকু ত্যাগ ও কোরবানির বিনিময়ে সত্যি যদি বিভ্রান্ত মানবতা মুক্তির পথ পেয়ে যায় এবং কল্যাণ ও শান্তির ঠিকানায় পৌছে যায়, বলতেই হবে, 'বড় সস্তায় পাওয়া সওদা'। আল্লাহ-প্রেমের পাকা সওদাগর এক কবি বড় সুন্দর বলেছেন–

আয় দিল, তামাম নফা' হ্যয় সওদায়ে ইশক ম্যঁ
ইক জান কা যিয়াঁ, সো এয়সা যিয়াঁ ন্যহী
হে দিল, সমস্ত লাভ হলো ইশকের সওদায়,
তাতে যায় শুধু জান, তা এমন কি আর যাওয়া!

এ প্রসঙ্গে কোন অন্তর্দর্শী বলেছেন–

إنه لثمن قليل جدا لسلعة غالية جدا!!

বড় মূল্যবান পণ্যের জন্য বড় স্বল্প মূল্য!

ঘোড়সওয়ারি ও ফৌজি যিন্দেগী

বড় তিক্ত ও মর্মান্তিক বাস্তবতা যে, আরবজাতি আজ অতীতের সৈনিকসুলভ বহু বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। বিশেষ করে অশ্বচালনা, একসময় যা ছিল তাদের জাতীয় পরিচয়, তা এখন একদম শেষ হয়ে গেছে। আরবজীবনে এটা আসলেই বিরাট ক্ষতি ও বিপর্যয় এবং জিহাদের ময়দানে দুর্বলতা ও পরাজয়ের অন্যতম কারণ। তাদের ফৌজি জযবা ও সামরিক প্রেরণা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। আয়েশি জীবনের কারণে স্বাস্থ্য ও দৈহিক শক্তিতে ভাটা পড়েছে। আরামদায়ক গাড়ি এখন আরবদের একমাত্র বাহন। ফলে বিশ্বসেরা তেজিয়ান আরবী ঘোড়া এখন আরব জাযিরাতেই বিলুপ্তপ্রায়।

সামরিক প্রশিক্ষণ, শরীরচর্চামূলক খেলাধুলা, ঘোড়দৌড়, বর্শাচালনা, কুস্তিলড়াই, সাধারণ মানুষ এগুলো ভুলে এখন মজে আছে ক্ষতিকর যন্ত্রনির্ভর খেলাধুলায়। সুতরাং আরববিশ্বের নীতিনির্ধারক ও শিক্ষা-দীক্ষার নিয়ন্ত্রক ব্যক্তিবর্গের অপরিহার্য কর্তব্য হল আরব যুবশক্তিকে সৈনিকসুলভ বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিপালন করা, যাতে প্রতিটি যুবক শারীরিক শক্তি, দৃঢ়চিত্ততা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিপদ-দুর্যোগের মোকাবেলা করার মানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠে এবং সহজ সরল, অনাড়ম্বর ও শুষ্ক-রুক্ষ জীবনে অভ্যস্ত হতে পারে। মুসলিম উম্মাহর মহান মুরুব্বী ও দীক্ষাদাতা আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর অন্তর্দৃষ্টিতে এ বিষয়টির গুরুত্ব ধরা পড়েছিল। তাই তিনি আজমের বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত আরব প্রশাসকের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক দিক-নির্দেশনামূলক পত্রে লিখেছিলেন–

إياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس، فإنها حمام العرب، وتمعددوا، واخشوشنوا، واخشوشبوا، واخلولقوا، وأعطوا الركب أسنتها، وانزوا نزوا، وارموا الأغراض.

আরাম-আয়েশ ও আজমি পোশাক থেকে দূরেই থেকো। (শুধু ছায়ায় থেকো না) রোদের অভ্যাস বজায় রেখো, কারণ রোদই হচ্ছে আরবদের 'স্নান'। আহার-বিহার ও পোশাক-পরিচ্ছদে রুক্ষ, কঠোর ও সহিষ্ণু হও। (ধোপদুরস্তির পরিবর্তে) মোটা খসখসে ও পুরোনো জীর্ণ কাপড়ে অভ্যস্ত হও। ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে চড়ার ও লক্ষ্যভেদের অভ্যাস করো।[১]

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا.

[১] رواه البغوي عن أبي عثمان النهدي

হে ইসমাঈলের পুত্রগণ, তীরন্দাযি করো। কারণ তোমাদের পিতা ইসমাঈল তীরন্দায ছিলেন।[২]

অন্য এক হাদীছে সাবধান-অব্যয় ألا ব্যবহার করে বলেছেন–

ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي.

শোনো, তীরন্দাযিই হলো শক্তি, তীরন্দাযিই হলো শক্তি।[৩]

(আমার মনে হয়, মহাগুরুত্বপূর্ণ এ হাদীছটির চিরায়ত অনুবাদ হবে এই 'শোনো ক্ষেপণেই শক্তি, ক্ষেপণেই শক্তি', –অনুবাদক)

যারা আগামী প্রজন্মের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং যারা কর্ণধার ও নীতিনির্ধারক তাদের অপরিহার্য কর্তব্য হলো শিক্ষাঙ্গন এবং যুবশক্তির জীবন থেকে সর্বশক্তি দিয়ে ঐ সব উপাদান-উপকরণ দূর করা, যা যুবচরিত্রে শৌর্য সাহস, ঋজুতা ও পৌরুষ-এর বিলুপ্তি ঘটিয়ে দুর্বলতা, অক্ষমতা ও 'রমণীয়তা' সৃষ্টি করে। তাই নগ্ন-অশ্লীল, ধর্মদ্রোহী ও চরিত্রবিধ্বংসী সাহিত্য-সাংবাদিকতার মূলোৎপাটন করতে হবে, যা তরুণ ও যুবসমাজে কপটতা, লজ্জাহীনতা, পাপাচার, যৌনতা ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার বিষ ছড়ায়। অর্থ ও বাণিজ্যের লোভে যারা মুসলিমসমাজে অশ্লীলতা ও পাপাচার ছড়াতে ভালোবাসে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাদের প্রতিহত করতে হবে। কোনভাবেই যেন তারা মহোত্তম চরিত্রের ধারক মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিবিরে অনুপ্রবেশ করতে না পারে। সামান্য কিছু পয়সার জন্য পাপাচার, অনাচার, নগ্নতা ও যৌনতার মোহজাল বিস্তার করে যারা মুসলিম প্রজন্মের হৃদয় ও চরিত্র ধ্বংস করছে সমাজ থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

ইতিহাস সাক্ষী, যখনই কোন জাতির পুরুষ পৌরুষ ও মর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলে, আর নারীসমাজ নারিত্ব ও মাতৃত্ব পরিত্যাগ করে পর্দাহীনতা ও নগ্নতার পথে চলে যায়, ঘর ছেড়ে বাইরে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চায় এবং সৌন্দর্য রক্ষার নামে বন্ধ্যাত্বমুখী হয়ে পড়ে, তখনই তাদের ভাগ্যতারকা ডুবতে শুরু করে এবং নামনিশানা মুছে গিয়ে তারা 'ছিলো' থেকে 'নাই' হয়ে যায়।

এটাই ছিলো গ্রীক, রোমান ও পারসিক জাতির পরিণতি, আজকের ইউরোপও সেই পরিণতির পথে ধাবমান। সুতরাং সাবধান, হে আমার প্রিয় আরবজাতি! এ ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে সাবধান!!

শ্রেণীবৈষম্য ও অপচয় রোধ

আরেকটি দুঃখজনক বাস্তবতা এই যে, বস্তুবাদী পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাবে এবং আরো বিভিন্ন কারণে আরবজাতি আজ আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসে ভীষণভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। জীবনের অযথা প্রয়োজন, সাজসজ্জা ও প্রসাধন এবং সৌন্দর্য-বিলাসের পিছনে যেমন তেমনি পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার নামে ঘটছে আল্লাহর দেয়া বিপুল সম্পদের নির্দয় অপচয়। অথচ চোখধাঁধানো এ বিত্তজৌলুসের পাশাপাশি রয়েছে এমন মুখহা-করা অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও দৈন্য যে, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে, চোখে পানি আসে, বুকে ব্যথা জাগে, লজ্জায় মাথা ঝুঁকে যায়। একদিকে রয়েছে এমন মানুষ, যার অনেক খানাপিনা, সোনাদানা; রয়েছে বিশাল গাড়ীবহর ও বহু অট্টালিকা; বিস্তর অপচয় করেও বুঝে উঠতে পারে না কোথায় কীভাবে রাখবে সম্পদ। অন্যদিকে অসহায় আরববেদুঈন জোগাড় করতে পারে না নিজের ও পরিবারের ক্ষুধার অন্ন ও লজ্জা নিবারণের বস্ত্র। একদিকে ধনকুবের আরব শায়খ ধুলি উড়িয়ে ঝকঝকে গাড়ী হাঁকিয়ে ছুটে যান, অন্যদিকে ছিন্ন জীর্ণ কাপড়ে শীর্ণ মলিন চেহারায় কোন বেদুঈন পরিবার ক্লান্তপথে হেঁটে যায় এবং অবাক চোখে সেদিকে তাকায়। মাথায় রুমাল পেঁচানো আরব শায়খ ও তার সুখী পরিবার কিছু দেখলেন কি দেখলেন না, বোঝা যায় না।

তো আরবের শহর-নগর ও জনপদে যতদিন উঁচু উঁচু প্রাসাদ ও দামী দামী গাড়ী এবং গরীবের অপ্রশস্ত, অপরিচ্ছন্ন আলোবাতাসহীন ঘরবাড়ী একসঙ্গে দেখা যাবে এবং একই জনপদে দেখা যাবে সম্পদের সর্বপ্লাবী ঢল এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের অসহনীয় ধকল, ততদিন বিভিন্ন নামে বিভিন্ন শ্লোগানে চলতেই থাকবে সর্বনাশা দাঙ্গা-ফাসাদ ও বিপ্লব-গোলযোগ। শক্তির জোরে বা প্রচারণার ছলে কৌশলে তার গতি রোধ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ সর্বসুন্দর অর্থব্যবস্থা ও জীবনব্যবস্থাকে যদি প্রত্যাশিত ভূমিকা ও অবদান রাখার সুযোগ না দেয়া হয় তাহলে প্রবল প্রতিক্রিয়ারূপে এবং আল্লাহর আযাব হিসাবে কোন না কোন অপশাসন ও অভিশপ্ত ব্যবস্থা দেশ ও জাতির উপর চেপে বসবে এবং যুলুম, শোষণ, অনাচার ও স্বেচ্ছাচারের নতুন ঝড় বয়ে যাবে।

বিশ্ব নেতৃত্বের শীর্ষ চূড়ায়

কী বিরাট ও কল্যাণপ্রসূ বিপ্লবই না সৃষ্টি হয়েছিলো আরবজাতির ইতিহাসে মুহম্মদী নবুয়তের আবির্ভাবের পর, যার কথা বলা হয়েছে আল কোরআনে সূরাতুল ইসরায়, অলঙ্কারসমৃদ্ধ ও সুস্পষ্ট, সমুজ্জ্বল ভাষায়! কী বিরাট নেয়ামতই না আল্লাহ দান করেছিলেন তাঁর নবীর মাধ্যমে আরবজাতিকে! একটা ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ উপদ্বীপে তারা হানাহানি ও খুনাখুনিতে লিপ্ত ছিলো। এভাবেই হয়ত শেষ হয়ে যেতো এবং মুছে যেতো ইতিহাসের পাতা থেকে। কিন্তু তিনি তাদের বের করে আনলেন বিশাল বিস্তৃত বিশ্বের বুকে, তাকে শাসন করার জন্য এবং নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। গোত্রীয় জীবনের সঙ্কীর্ণ ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে তারা আবদ্ধ ছিলো। তিনি তাদের বিশ্বমানবতার সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে নিয়ে এলেন, বিভ্রান্ত মানবতাকে পথপ্রদর্শন করার জন্য।

এ বিরাট বিপ্লব ও পরিবর্তনের কল্যাণে তারা এমন মর্যাদার অবস্থানে চলে এলেন যে, সারা বিশ্বকে চমকে দিয়ে পারস্যসম্রাটের দরবারে সাহসী ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন–

الله ابتعثنا ليخرج بنا من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.

হ্যাঁ, সত্য কথা! প্রথমে তাঁরা নিজেরা বেরিয়ে এসেছেন পৃথিবীর সঙ্কীর্ণতা থেকে পৃথিবীর প্রশস্ততার দিকে, তারপর বের করে এনেছেন মানবজাতিকে। গোত্র, সম্প্রদায় ও জাতীয়তাভিত্তিক জীবনের চেয়ে সঙ্কীর্ণ জীবন আর কী হতে পারে? এবং ন্যায়, সাম্য ও মানবতাভিত্তিক জীবনের চেয়ে প্রশস্ত ও উদার জীবন কী হতে পারে? তদ্রূপ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাসের জন্য দৌড়ঝাঁপ ছাড়া আর কোন লক্ষ্য নেই যে জীবনের, তার চেয়ে সঙ্কীর্ণ জীবন আর কী হতে পারে? এবং ঈমান, রূহানিয়াত, আখেরাত ও জান্নাতের অনন্ত সৌভাগ্যের উপর যে জীবনের ভিত্তি তার চেয়ে প্রশস্ত জীবন আর কী হতে পারে?

মুহম্মদী নবুয়তের মহান বিপ্লবের

---

[২] رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في كتاب الجهاد والسير، وفي كتاب أحاديث الأنبياء، وفي كتاب المناقب، وأحمد في مسنده (في مسند المدنيين)

[৩] رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه في كتاب الإمارة، وأبو داود في كتاب الجهاد، وابن ماجه في كتاب الجهاد، وأحمد في مسند (مسند الشاميين) والدارمي في كتاب الجهاد

কল্যাণে তাঁরা বের হয়ে এলেন জাযীরাতুল আরবের সঙ্কীর্ণ সীমানা থেকে, যেখানে ছিলো শুধু জীবনের দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা, ছিলো জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সমস্যার চিন্তা, ছিলো সামান্য সম্পদ, সামান্য নেতৃত্ব ও তুচ্ছ অহমিকার জন্য হানাহানি ও রক্তপাত; সেখান থেকে তাঁরা বের হয়ে এলেন এক নতুন পৃথিবীর মুক্ত প্রাঙ্গণে, যেখানে তাঁদের প্রতীক্ষায় ছিলো নৈতিক, আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মহাগৌরব।

দানিউব, নীল, দজলা-ফুরাত ও সিন্ধুনদ তাঁদের কাছে সামান্য খাল-নালা ছাড়া আর কিছু নয়। আলেপ্পো ও পিরেনিজ পর্বতমালা, সিরিয়া ও লেবাননের পাহাড়শ্রেণী এবং হিমালয়ের সুউচ্চ চূড়া ও শিখর তাদের কাছে টিলা-টিবির চেয়ে বেশি কিছু নয়। ভারত, চীন ও তুর্কিস্তানের বিশাল বিস্তৃত দেশ তাদের কাছে ক্ষুদ্র পল্লী ও সামান্য জনপদ ছাড়া কিছু নয়। আরো সুন্দর করে বলা যায়, 'পৃথিবীর সমগ্র ভূখণ্ডকে যদি বিশ্বনেতৃত্বের শীর্ষস্থান থেকে অবলোকন করা হয় তাহলে টেবিলের উপর মেলে ধরা একটি রঙ্গীন সাধারণ মানচিত্রই শুধু মনে হবে। আর এই সব বিরাট জাতি ও জনগোষ্ঠীকে তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন ও বিপুল জ্ঞানসম্পদসহ মনে হবে বড় কোন ঘরানার ছোট ছোট পরিবার।

এই বিরাট 'পৃথিবী' অস্তিত্ব লাভ করেছিলো এক অভিন্ন ঈমান-আকীদা এবং এক সুদৃঢ় আত্মিক সম্পর্কের উপর, যা ছিলো ইতিহাসের দেখা বিস্তৃততম পৃথিবী। আর যেসব জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে এই বিরাট 'পরিবার' গড়ে উঠেছিলো তা ছিলো ইতিহাসের দেখা সবচে' সংহত মানবপরিবার, যাতে বিভিন্ন প্রকৃতির সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন জাতির মেধা ও প্রতিভা দ্রবীভূত হয়ে একটি অভিন্ন সংস্কৃতির রূপ ধারণ করেছে, যার নাম ইসলামী সংস্কৃতি। এ মহান সংস্কৃতির 'গর্ভ' থেকে যুগে যুগে এত বিপুল পরিমাণে ইসলামী প্রতিভা জন্মগ্রহণ করেছে, যার সংখ্যা-শুমার আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারে না। এবং ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক এত এত কর্ম ও কীর্তি সম্পন্ন হয়েছে, ইতিহাসের বিস্তৃত পরিসরেও যা সম্ভব হয়নি।

এ নতুন নেতৃত্ব অধিকার ও যোগ্যতাবলেই বিশ্বনেতৃত্বের সমগ্র ইতিহাসের অভিজাততম, বিরাটতম ও শক্তিশালীতম নেতৃত্ব বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই নেতৃত্ব দ্বারা আরবজাতিকে আল্লাহ মর্যাদাবান করেছেন। তারা ইসলামী দাওয়াত-এর প্রতি পূর্ণ আন্তরিক ও আত্মনিবেদিত হয়েছিলো এবং এই মহান দাওয়াত ধারণ করা, রক্ষা করা ও বহন করার জিহাদ-মুজাহাদায় নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিলো। তাই বিশ্বের মানবমণ্ডলী তাদের এমন ভালোবেসেছে, যার তুলনা নেই এবং প্রতিটি বিষয়ে তাদের এমন অনুসরণ করেছে, যার কোন নযির নেই। তাদের ভাষার প্রতি বিভিন্ন ভাষা, তাদের সংস্কৃতির প্রতি বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং তাদের সভ্যতার প্রতি বিভিন্ন সভ্যতা আনুগত্য প্রকাশ করেছে। ফলে তাদের ভাষাই ছিলো সভ্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জ্ঞানসাধনা ও গ্রন্থরচনার ভাষা। সর্বোপরি তাদের ভাষা এমন প্রিয়তা ও পবিত্রতা অর্জন করেছিলো যে, মানুষ যে ভাষায় বড় হয়েছে, প্রতিপালিত হয়েছে এবং যে ভাষায় তার মুখে কথা ফুটেছে সেই মাতৃভাষার উপরও তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং 'ভাষাপুত্র'দের সমান, বরং আরো অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। এমন উচ্চস্তরের ভাষা-বিশারদ, সাহিত্যসাধক ও লেখক-গবেষকের আবির্ভাব ঘটেছে, যাদের প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বয়ং আরববিশ্বের সুশীল সমাজ, সাহিত্যিক ও সমালোচকমহল স্বীকার করে নিয়েছেন।

তাদের সভ্যতাই ছিলো আদর্শ সভ্যতা, যার গৌরবকীর্তন করেছে সর্বভাষার, সর্বজাতির মানুষ, এবং যা গ্রহণ ও বরণ করে তারা আভিজাত্য বোধ করেছে এবং উলামায়ে দ্বীন যাকে অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন এবং এ সভ্যতার বিপরীতে সমস্ত সভ্যতাকে জাহেলি সভ্যতা ও আজমি সভ্যতা বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং ঐ সকল সভ্যতার রীতি-নীতি, ভাব ও অভিব্যক্তি গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

এই সর্বব্যাপী ও সর্বাঙ্গীণ নেতৃত্ব দীর্ঘ বহু যুগ স্বমর্যাদায় ও স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত ছিলো। কোন জনগোষ্ঠী এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বা এর 'কবল' থেকে উদ্ধার লাভের কথা চিন্তাও করেনি; যেমনটি ঘটে থাকে প্রত্যেক পরাস্ত, বিজিত ও শাসিত-শোষিত জাতির পক্ষ হতে। কিন্তু আরবজাতির ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। কেননা এই মহান নেতৃত্বের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিজেতা ও বিজিত, শাসক ও শাসিত এবং দাস ও মনিবের সম্পর্ক ছিলো না, বরং ছিলো মুমিনের সঙ্গে মুমিনের এবং ধর্মনিষ্ঠ মানুষের সঙ্গে ধর্মনিষ্ঠ মানুষের। খুব বেশী হলে বলা যায়, এ সম্পর্ক ছিলো অনুগামী ও অগ্রগামীর মধ্যে অনুসরণের সম্পর্ক; যেখানে অনুগামী অগ্রগামীর এ অবদান ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে যে, হক ও সত্যকে তারাই আগে জেনেছেন; দাওয়াতকে তারাই আগে গ্রহণ করেছেন এবং হকের দাওয়াত ও সত্যের আহ্বানের পথে তারাই জানমালের কোরবানি দিয়েছেন। সুতরাং বিদ্রোহের, অসন্তোষের এবং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন অবকাশই নেই, বরং তাদের অবদান স্বীকার করা, এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই হলো ভদ্রতা ও আভিজাত্যের দাবী। কোরআনের ভাষায়–

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আল্লাহ, ক্ষমা করুন আমাদের এবং আমাদের ভাইদের, যারা আমাদের অগ্রে ঈমান এনেছে। আর আমাদের অন্তরে, যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রেখেন না। হে আমাদের প্রতিপালক, নিঃসন্দেহে আপনি কোমল ও দয়ালু। –সূরা আলহাশর (৫০) : ১০

এমনই ঘটেছিলো, বিজিত জাতিবর্গ আরবজাতিকে বিজয়ী শাসক না ভেবে ভেবেছে শিরক ও জাহেলিয়াত থেকে মুক্তিদাতা, শান্তির আবাস জান্নাতের পথে আহ্বানকারী ও পরিচালনাকারী এবং নীতি, নৈতিকতা, আদব ও শিষ্টাচারের শিক্ষাদানকারী।

এটাই হচ্ছে সেই বিশ্বনেতৃত্ব, নবুয়তে মুহম্মদীর শুভাগমন যার বিনির্মাণ করেছে, এবং যার ঘোষণা এসেছে সূরাতুল ইসরায়। এই নেতৃত্বকে পরম মমতায় ও সযত্ন সতর্কতায় আঁকড়ে ধরে রাখা আরবজাতির অপরিহার্য কর্তব্য। সব মেধা, প্রতিভা এবং সাধ্য ও যোগ্যতা এর পিছনেই ব্যয় করে যাওয়া উচিত; প্রজন্ম-পরম্পরায় দাওয়াত সম্পর্কে অছিয়ত করে যাওয়া উচিত। ধর্ম, বিবেক, বুদ্ধি ও গায়রত– কোন দৃষ্টিতেই আরবদের জন্য এর বৈধতা নেই যে, কোন যুগে কোন কারণে এই নেতৃত্বের দায়ভার থেকে তারা সরে আসবে। কেননা এই নেতৃত্বের মধ্যে প্রত্যেক নেতৃত্বের পূর্ণ বিকল্প রয়েছে এবং আরো অধিক কিছু রয়েছে। কিন্তু কোন নেতৃত্বে না আছে এর বিকল্প, না আছে ন্যূনতম যথেষ্টতা এ নেতৃত্ব সর্বপ্রকার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে নিজের পরিধিতে বেষ্টন করে এবং তা দেহ ও শরীরের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করার চেয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করে হৃদয় ও আত্মার

উপর কর্তৃত্ব করার বিষয়কে।

এই নেতৃত্ব লাভের পথ আরবজাতির জন্য সহজ, সরল ও পরিচিত এবং নিজেদের প্রথম যুগে একবার তারা তা পরীক্ষা করেও দেখেছে। আর তা হলো ইসলামী দাওয়াতের প্রতি ইখলাছ, ঐকান্তিকতা ও আত্মনিবেদন; মনে-প্রাণে ইসলামী দাওয়াতকে গ্রহণ ও বরণ; ইসলামী দাওয়াতের পথে আত্মত্যাগ ও সর্বস্ব বিসর্জন এবং অন্যসব জীবনব্যবস্থার উপর ইসলামী ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদান, এপথেই– তবে নেতৃত্ব লাভের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ছাড়া– বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের আনুগত্য গ্রহণ করবে, তাদের অনুসরণ করবে এবং তাদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ করবে।

এভাবেই শুধু পৃথিবীর পূর্বে পশ্চিমে সর্বত্র তাদের জন্য খুলতে পারে বিজয়ের নতুন নতুন দুয়ার ও নতুন নতুন দিগন্ত, যা সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী পাশ্চাত্যের জন্য কখনো উন্মুক্ত হয়নি; বরং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে।

এভাবেই ইসলামের আলোকিত অঙ্গনে প্রবেশ করতে পারে নতুন নতুন জাতি ও জনগোষ্ঠী, যাদের মেধা, প্রতিভা, যোগ্যতা ও গুণভাণ্ডার এখনো নির্ভেজাল ও ব্যবহার-দোষ থেকে মুক্ত, সম্পূর্ণ নতুন অবস্থায় রয়েছে। ফলে তারা সহজেই ইউরোপের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির সফল মোকাবেলা করতে সক্ষম, যদি তারা পেয়ে যায় নতুন দ্বীন, নতুন ঈমান, নতুন প্রাণ, নতুন বার্তা, নতুন পায়গাম।

আর কতদিন হে আরব, ক্ষুদ্র তুচ্ছ ক্ষেত্রে তোমাদের বিপুল শক্তির অপচয় করে যাবে, যা দ্বারা প্রাচীন বিশ্বকে একবার তোমরা জয় করেছিলে? এই সর্বপ্লাবী জোয়ার আর কত দিন এই সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় আবদ্ধ থাকবে, যা একদিন সমস্ত সভ্যতা ও স্বেচ্ছাচারী শাসকদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো?

এবার ওঠো, জাগো এবং এই বিস্তৃত মানবসমাজের প্রতি মনোযোগী হও, যাদের নেতৃত্বদানের এবং পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তোমাদের মনোনীত করেছেন। আর নবুয়তে মুহম্মদী ও দাওয়াতে মুহম্মদীই হচ্ছে তোমাদের ইতিহাসে এবং মানবজাতির ইতিহাসে এক নবযুগের শুভ উদ্বোধন এবং তোমাদের ভাগ্য ও সমগ্র বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণের সূচনা। সুতরাং এই দাওয়াত নতুনভাবে তোমরা গ্রহণ করো এবং এর জন্য জান-মাল সর্বস্ব কোরবান করো। আর আল্লাহ তা'আলার এই আহ্বানে লাব্বাইক বলে সাড়া দাও–

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَاجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো তাঁর রাস্তায় জিহাদের হক অনুযায়ী, তিনিই তোমাদের মনোনীত করেছেন (তাঁর দ্বীনের জন্য)। আর দ্বীনের বিষয়ে তিনি তোমাদের উপর কষ্টকর কিছু আরোপ করেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত আঁকড়ে ধর। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম, পূর্বেও এবং এই কোরআনেও; যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন, আর তোমরা সাক্ষী হও মানুষের 'উপর'। সুতরাং তোমরা ছালাত কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো, আর আল্লাহকে আঁকড়ে ধরো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক, সুতরাং কত না উত্তম অভিভাবক এবং কত না উত্তম সাহায্যকারী! –সূরা আলহাজ্জ (২২) : ৭৮

আরববিশ্বের কাছে ইসলামী বিশ্বের প্রত্যাশা

আরববিশ্ব তার স্বকীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক অবস্থান এবং রাজনৈতিক (ও সামরিক) গুরুত্বের কারণে দাওয়াতে ইসলাম-এর সুমহান দায়িত্বপালনের সবচে' বড় হকদার। এখন সে যা করতে পারে তা হলো, ইসলামী বিশ্বের নেতৃত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করা। তারপর পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে পূর্ণ যোগ্যতার অবস্থান থেকে ইউরোপের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলা। তখন সে তার ঈমান ও দাওয়াতের শক্তি এবং আল্লাহর গায়বী মদদ ও সাহায্য দ্বারা ইউরোপের উপর নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করতে পারবে, (হয় যুদ্ধ করে কিংবা বিনা যুদ্ধে)। এভাবে দুনিয়াকে সে অকল্যাণ থেকে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করতে পারবে। ইউরোপীয় জাহেলিয়াতের আজকের তাগুত যারা, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ণ সাহসের সঙ্গে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে পারবে, যেমন মুসলিম দূত একদিন পারস্যের রাজদরবারে ঘোষণা করেছিলেন–

'আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন তোমাদের বের করে আনতে, মানুষের দাসত্ব থেকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে এবং পৃথিবীর সঙ্কীর্ণতা থেকে পৃথিবীর প্রশস্ততার দিকে এবং নানা ধর্মের অবিচার থেকে ইসলামের সুবিচারের দিকে।'

মানবজাতি আজ নিজেদের মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তারূপে মুসলিমবিশ্বের দিকে আশা ও প্রত্যাশার ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পক্ষান্তরে মুসলিমবিশ্ব আজ তাদের নেতৃত্ব ও 'রাহবারি' গ্রহণ করার জন্য আরববিশ্বের প্রতীক্ষায় রয়েছে। মুসলিমজাতি কি মানবজাতির আশা ও প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারবে? আর আরববিশ্ব কি মুসলিমবিশ্বের আহ্বানে, আন্দোলনে সাড়া দিতে পারবে? বহু যুগ ধরে মজলুম মানবতা এবং ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত মানবজাতি কবি ইকবালের দরদপূর্ণ কবিতার ভাষায় মুসলিমজাতির কাছে ফরিয়াদ করে আসছে, আর এখনো তারা বিশ্বাস করে যে, যে নিবেদিতপ্রাণ মানুষের হাত কা'বা নির্মাণ করেছিল তারাই আজ পারবে পৃথিবীর 'নব-নির্মাণে'র মহান দায়িত্ব পালন করতে। ইকবালের কবিতা–

ناموس ازل را تو امینی تو امینی
دارائے جہاں را تو یساری تو یمینی
اے بندۂ خاکی تو زمانی تو زمینی
صہبائے یقیں درکش واز دیر گماں خیز
از خواب گراں ،خواب گراں ،خواب گراں خیز
ازخواب گراں خیز
فریاد از افرنگ ودل آویزئ افرنگ
فریاد زشیرینی وپرویزئ افرنگ
عالم ہمہ ویرانہ زچنگیزئ افرنگ
معمار حرم! باز بہ تعمیر جہاں خیز!
ازخواب گراں، خواب گراں ،خواب گراں خیز
ازخواب گراں خیز

হে মুসলিম, ঊর্ধ্বজগতের শাশ্বত বার্তার তুমি বিশ্বস্ত ধারক/বিশ্বজগতের মহান অধিপতির তুমি নিবেদিত সেবক/হে মাটির বান্দা, যমীন তোমার, যামানা তোমার/ঈমানের শরাব পান করো, কুফুরির বুতখানা থেকে বেরিয়ে এসো/জেগে ওঠো, জেগে ওঠো, ঘুমের ঘোর থেকে জেগে ওঠো।

ধিক ফিরিঙ্গীকে ও তার ছল ও ছলনাকে/কখনো সাজে লাইলী, কখনো মজনু/ফিরিঙ্গীর চেঙ্গিজিতে জাহান আজ বরবাদ/হে হারামের নির্মাতা, ফিরে এসো বিশ্বের বিনির্মাণের জন্য/জেগে ওঠো, জেগে ওঠো, ঘুমের ঘোর থেকে জেগে ওঠো। ●

বক্তৃতা

②

বস্তুবাদী সভ্যতা : এক মর্দে মুমিনের দৃষ্টিতে

হামদ ও সালাতের পর :

সুধী ও বন্ধুগণ!

আরব ঐতিহাসিকেরা একটি ঘটনা বয়ান করেছেন, যা আমাদের গভীর মনোযোগ দাবি করে, কিন্তু তা আমরা সাধারণত খুব সহজভাবে পড়ে চলে যাই। ঘটনাটি দিয়েই আমি আজকের আলোচনা শুরু করছি। বিষয়বস্তুর সাথেও তা সঙ্গতিপূর্ণ। ঘটনাটি আমাদের জানায়, বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতার ব্যাপারে একজন সচেতন মুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত।

প্রথম যুগের ইসলামী দিগ্বিজয়ের ইতিহাসে আপনারাও এই ঘটনা পড়েছেন। তবে জানি না, যেভাবে তা আমার মনে রেখাপাত করেছে আপনাদেরও মনে করেছে কি না; এবং যে গভীর মর্ম ও বার্তা সে আমাকে দিয়ে গেছে আপনাদেরকেও দিয়েছে কি না। হ্যাঁ, কখনো কখনো এমন হয়, একটি বাণী বা ঘটনা একজন সাধারণ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করলেও বিদ্যা-বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতায় তার চেয়ে অগ্রসর অনেকের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয় না।

আরব ঐতিহাসিকেরা ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন তাদের স্বভাবসুলভ সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর ভাষায়, কোনো টীকা ও ভাষ্য ছাড়া।

পারস্য সাম্রাজ্যের সেনাপতি রুস্তম মুসলিম-বাহিনীর সেনাপতি সায়েদুনা সা'দ বিন আবী ওয়াককাস রা.-এর কাছে বার্তা পাঠিয়েছিল, তিনি যেন কোনো মুসলিমকে তাদের কাছে পাঠান, যার সাথে তাদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কথা বলা যায়। কারণ পারসিকদের জন্য এ অভিযান ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা। এক ধরনের আকস্মিকতা, পারসিকেরা যা প্রত্যাশা করতে পারেনি। আরবেরা তো দরিদ্র অনাড়ম্বর জীবনেই অভ্যস্ত ছিলেন। সাধারণ অবস্থায় বাইরের জগৎ থেকেও বিচ্ছিন্ন ছিলেন। পার্শ্ববর্তী সাম্রাজ্যসমূহের ব্যাপারে তাদের কোনো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ কখনো লক্ষ্য করা যায়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী তাদের বৈচিত্র্যহীন মরু-জীবনের বৃত্তেই আবর্তিত ছিল। কাজেই তারা যখন তাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রোম-ফারিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে বের হল তখন স্বভাবতই তা কৌতূহলের উদ্রেক করল। প্রতিপক্ষের সামনে তা একটি বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়াল।

তো রুস্তমের বার্তা পেয়ে হযরত সা'দ রা. রিবয়ী ইবনে আমির রা.-কে পাঠালেন। এদিকে রুস্তমের রাজসিক দরবার; রেশমের গদী, সোনার কারুকাজ করা তাকিয়া, বহুমূল্য রত্ন ও মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি; জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক ও বহুমূল্য রাজমুকুটে শোভিত রুস্তম স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট। এক গমগমে ভীতিপ্রদ পরিবেশ। কিন্তু রিবয়ী ইবনে আমের রা. এসবের কোনো তোয়াক্কাই করলেন না। এই রাজসিক জৌলুস তাঁকে কিছুমাত্রও প্রভাবিত করল না। তিনি রুস্তমের একেবারে পার্শ্বে গিয়ে উপবেশন করলেন যেন তাঁর কোনো সঙ্গীর পার্শ্বে বসেছেন। একপর্যায়ে রুস্তম জিজ্ঞাসা করল–

مَا جَاءَ بِكُمْ؟

কেন তোমরা এসেছ?

তিনি বললেন–

اللّٰهُ ابْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللّٰهِ.

আল্লাহ আমাদের আবির্ভূত করেছেন যেন আমরা ঐ সকল মানুষকে বান্দার বন্দেগী থেকে আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়ে আসি, যাদের ব্যাপারে তিনি ইচ্ছা করেছেন।

وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَتِهَا، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، فَأَرْسَلَنَا بِدِينِهِ إِلَى خَلْقِهِ لِنَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ.

বন্ধুগণ!

এই সহজ ও সারগর্ভ বক্তব্যের তিনটি বাক্যের প্রতিটির উপর আমি কথা বলব না; আমি কথা বলব শুধু একটি বাক্যের উপর। সেটি হচ্ছে এই শাহানা শান-শওকত ও রাজকীয় প্রতাপের সাথে উপবিষ্ট রুস্তমকে লক্ষ্য করে এ মর্দে মুমিনের এই বাক্যটি–

مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَتِهَا.

'দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে দুনিয়ার প্রশস্ততার দিকে।'

আমি তাঁর مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللّٰهِ বাক্যে অভিভূত হইনি। তেমনি তাঁর مِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ বাক্যেও না। কারণ এক আল্লাহর ইবাদত আর ইসলামের সুবিচার তো সেইসকল মুসলিমের কাছে ছিল এক সহজ সত্য, যাদের অন্তরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের আকীদা বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন, আল্লাহর ইচ্ছায় যাদের কাছে ঈমান ছিল প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত, আর কুফ্‌র, ফিস্‌ক ও নাফরমানী ছিল অপ্রিয়, অনাকাঙ্ক্ষিত। পৌত্তলিকতা ও মানবপূজা তাঁদের দৃষ্টিতে ছিল অতি হীন ও ঘৃণিত। তাঁদের রুচি ও স্বভাবে এসবের কোনো স্থান ছিল না।

হযরত ইবনে আমের রা. জানতেন, ফারিসের আমির-উমারা প্রজাসাধারণকে তাদের উপাসকে পরিণত করেছে। এদের সাথে তাদের আচরণ কেবল প্রভু-ভৃত্যের ছিল না, ছিল উপাস্য ও উপাসকের। প্রজারা এদের সামনে দাঁড়াত নতশিরে বুকে হাত বেঁধে। এদের সম্মুখে সিজদা করত। রাজপরিবারকে মনে করা হত অতিমানব, যাদের শিরা-উপশিরায় পবিত্র ঐশ্বরিক শোণিত প্রবাহিত।

আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ বিশ্বাস করতেন একমাত্র ইসলামই ন্যায় ও ইনসাফের শরীয়ত আর অন্য সকল ধর্ম ও মতবাদ অন্যায়-অবিচারে পূর্ণ, যা মানুষকে মানুষের দাসত্বে নিয়োজিত করে এবং সাধু-পুরোহিতের বান্দায় পরিণত করে। তাদেরকে এমন সব রীতি ও বিধানের নিগড়ে আবদ্ধ করে, যার পক্ষে আল্লাহ কোনো দলীল নাযিল করেননি। তাঁরা কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেছিলেন–

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

... যারা অনুসরণ করে রাসূলের, উম্মী নবীর, যাঁর উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জিল, যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হলাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার থেকে ও শৃংখল থেকে, যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে সম্মান করে এবং যে নূর তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম। –সূরা আ'রাফ (৭) : ১৫৭

তাঁরা পড়েছিলেন আল্লাহর কালাম–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

হে মুমিনগণ! পণ্ডিত এবং সংসার বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। –সূরা তাওবা (৯) : ৩৪

এই বাণী ও বার্তার উপর তাঁদের ছিল গভীর ঈমান এবং এর বাস্তব উদাহরণ তাঁরা দেখেছেন রোমের নাসারা, ফারিসের অগ্নিপূজক, মদীনার ইহুদী প্রভৃতি ধর্ম-জাতির মাঝে।

রিবয়ী ইবনে আমের রা. যদি বলতেন–

من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة.

'দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে'

তাহলেও আমি বিস্মিত হতাম না। কারণ তিনি ঈমান এনেছেন আখিরাতের অনিঃশেষ জীবনের উপর, জান্নাতের অফুরন্ত প্রশস্ততার উপর। তিনি যে কিতাবের উপর ঈমান এনেছেন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে যাকে 'ইমাম' বানিয়েছেন তাতে উৎকীর্ণ আছে এই বাণী–

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.

তোমরা ধাবমান হও স্বীয় রবের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। –সূরা আলে ইমারন (৩) : ১৩৩

বদরের যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবানে উচ্চারিত হয়েছে–

قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ.

ঐ জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যা যমীন ও আসমানসমূহের মতো প্রশস্ত। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯০১ তিনি আরো বলেছেন–

مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

জান্নাতের একটি বেত্র পরিমাণ স্থানও পৃথিবী ও পৃথিবীর সব থেকে শ্রেষ্ঠ। –সহীহ বুখারী, হাদী ৩২৫০; সহীহ মুসলিম আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে

কাজেই তিনি যদি বলতেন, তোমাদের নিয়ে যাব দুনিয়ার অপ্রশস্ততা থেকে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে তাহলে আমি বিস্মিত হতাম না। কিন্তু তিনি তো সে কথা বলেননি। তিনি বলেছেন অন্যকথা–

مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَتِهَا.

দুনিয়ার অপ্রশস্ততা থেকে এর প্রশস্ততার দিকে। জ্বী, দুনিয়ার প্রশস্ততা।

এখানে আমি আশ্চর্য হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করছি, কী সেই প্রশস্ততা, যা আরবেরা উপভোগ করছিল? আর কী সেই সংকীর্ণতা, যাতে পারসিকেরা বন্দী ছিল? যে কারণে রিবয়ী রা. বলছেন, হে ভাগ্যাহত পারসিকেরা! আমরা আরব মুসলিমেরা এসেছি তোমাদের মুক্ত করতে দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে, দিতে এসেছি প্রশস্ত জীবনের স্বাদ।

সেকালের আরব-জীবন কি প্রশস্ত জীবন ছিল? আর পারসিকদের জীবন সংকীর্ণ জীবন? এই প্রশ্ন আমরা ইতিহাসকে করতে পারি। সে এক বিশ্বস্ত সাক্ষী। আরবের ইতিহাস রোম ও ফারিসের ইতিহাস, লিপিবদ্ধ ও সংকলিত। বহু সাক্ষী ও বর্ণনার বিশ্বস্ত সূত্রে সংরক্ষিত। কাজেই সেকালের আরব-জীবন যদি বাস্তবেই প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন হয়ে থাকে তাহলে ইতিহাস কখনো তা গোপন করবে না। তদ্রূপ পারসিকদের জীবন যদি দুঃখ-দুর্দশার জীবন হয়ে থাকে সেটাও অজানা থাকবে না। কিন্তু ঐতিহাসিকরা একমত, রোম-ফারিসের জীবন ছিল প্রাচুর্যের মখমল জীবন, বিলাসিতার কমনীয় জীবন। পক্ষান্তরে আরবের জীবনযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের আবির্ভাবের পরেও তারা ছিলেন রুক্ষ মিতাচারী জীবনে অভ্যস্ত। সময়টা ছিল আমীরুল মুমিনীন ওমর রা-এর খেলাফতকাল। আরবেরা তখনও তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি, ইসলামী আরবীয় স্বভাব-প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। জীবনযাত্রা তখনও জটিল ও আরোপিত হয়ে ওঠেনি; তা ছিল প্রকৃতির মতোই সহজ সাবলীল। স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন ওমর রা. যাপন করতেন কৃচ্ছতা ও মিতাচারের জীবন। জনসাধারণকেও পরিচালিত করতেন মিতাচারী জীবনে। আরব উপদ্বীপের এই মরুময় জীবন রোম-ফারিসের চোখে ছিল দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা, ওদের দৃষ্টিতে করুণা ঝরত– আহা! কী বঞ্চনা! কী সংকীর্ণতার জীবন!

কাজেই প্রশ্ন জাগছে, কী সেই সংকীর্ণতা, যাতে পারসিকেরা বন্দী ছিল? যে কারণে তাদের প্রতি আরব মর্দে মুমিনের এই করুণা ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ উচ্চারণ? আর কী সেই প্রশস্ততা, যা আরবেরা উপভোগ করছিল, যার আনন্দে এই সাহাবী উৎফুল্ল?

এটা কি কপটতার অতিরঞ্জন? আরবেরা তো এতে অভ্যস্ত ছিল না। ইসলাম তো কোনো মুসলিমকেই অনুমতি দেয় না এই মিথ্যা গৌরবের, কপট অতিরঞ্জনের। আর সেই প্রথম যুগের মানুষেরা তো পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন অতিরঞ্জন অতিশয়তা থেকে, ফাঁকা বুলির প্রবণতা থেকে। তাঁরা ছিলেন সত্যভাষী ও স্পষ্টভাষী, সত্যনিষ্ঠ ও সৎসাহসী তাহলে এই 'সংকীর্ণতা' মানে কী?

আরবের মরুচারী এক মানুষ যখন সেই রাজসিক দরবারে প্রবেশ করেছেন; বরং পারস্য-সাম্রাজ্যের সীমানায় যখন পা রেখেছেন তখনই তো এই ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য্য, এই বিলাস-ব্যসন দৃষ্টে তাঁর মাথা ঘুরে যাওয়ার কথা। এই বহুমূল্য বস্তুসামগ্রী, উপাদেয় খাদ্য-সম্ভার, ভোগবিলাসের অজস্র উপকরণ, উন্নত সভ্যতার নানাবিধ নিদর্শন, যা মর্যাদায়-আভিজাত্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত। পারসিকেরা তাদের উদ্ভাবন ও অভিজ্ঞতা, বিপুল বিজয়াভিযান ও অপরিমেয় সম্পদের দ্বারা এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। কী তাতে ছিল না? উন্নত শহর-নগর, আলীশান অট্টালিকা, নয়নাভিরাম দালান-কোঠা, মনোরম বাগ-বাগিচা, বর্ণিল বিনোদনকেন্দ্র, পণ্যদ্রব্যে সমৃদ্ধ বিপনী-বিতান, দেশি-বিদেশি আরো কত দ্রব্য সামগ্রী! বিলাসী জীবনের এই সকল উপকরণ, চিত্তহারী, স্নায়ুঅবশকারী এই সকল কিছুকে অবহেলা ভরে পায়ে ঠেলে এগিয়ে এল যে সকল আরব তারা আসলে কোন্ ধাতুতে গড়া ছিল?

রিবয়ী ইবনে আমের রা.-এর এই দীপ্ত বাক্যটি নিয়ে যতই চিন্তা করি ততই অভিভূত হই– হে পারসিকেরা! আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রশস্ত জীবনের স্বাদ দেয়ার জন্য।

কেন তাঁর কণ্ঠে এই বাক্য উচ্চারিত হল?

কারণ, এইসব আমীর-উমারাকে তাঁর মনে হয়েছে যেন সাজপোশাকে সজ্জিত কিছু পুতুল কিংবা দক্ষ ভাস্করের নিপুণ হাতে নির্মিত কিছু নিখুঁত ভাস্কর্য! কী তার অঙ্গ-সৌষ্ঠব! কী অসাধারণ মুখভঙ্গি! কিন্তু শেষ বিচারে তা কাঠ-পাথরের নিষ্প্রাণ মূর্তি বৈ তো নয়।

ইসলামী বাহিনীর এই সৈনিক হয়ত রিবয়ী ইবনে আমের রা.-এর কাছে সেনাপতি রুস্তমকে মনে হয়েছে স্বর্ণের খাঁচায় বন্দী এক আদুরে বিহঙ্গ। আর কিসরা ইয়াজদগির্দ, যার দর্শন তিনি

তখনো পাননি, যেন এক ময়না বা ময়ূর কিংবা পৃথিবীর এক সুন্দরতম পাখী। কিন্তু সে বন্দী এক সোনার খাঁচায়, যে খাঁচা স্বর্ণের, খাঁচার প্রতিটি শিক স্বর্ণের, সোনার খাঁচায় তার পানাহারের পাত্রগুলোও স্বর্ণের; কিন্তু এই সোনায় মোড়ানো পাখীটির উপর কি ঈর্ষা হতে পারে এমন কোনো মানুষের, যে বোঝে জীবনের মূল্য, জ্ঞানের মর্যাদা, যে পেয়েছে স্বাধীনতার স্বাদ? এই স্বর্ণ-বিহঙ্গের উপর কি হিংসা হতে পারে এমন কারো, যাকে আল্লাহ দান করেছেন মনুষ্যত্বের মর্যাদা? এই জন্য যে, এই পাখীটি থাকে স্বর্ণের খাঁচায় আর সে বাস করে কুঁড়ে ঘরে?

আরেকটু এগিয়ে বলতে পারি, কারো কি হিংসা হতে পারে এমন একটি কুকুরের উপর, যে প্রতিপালিত তার ইউরোপিয়ান মনিবের অফুরন্ত আদর সোহাগে? তার জন্য রয়েছে সুস্বাদু খাবার, সুমিষ্ট ফল, সুপেয় দুধ! আছে সোনারূপার গলাবন্ধ! আছে নরম তুলতুলে শয্যা?

সোনার পিঁজরায় বন্দি একটি পাখি কিংবা ইউরোপীয় মনিবের আদর-সোহাগে পালিত একটি কুকুরকে আমরা যে নজরে দেখি, পারস্য সেনাবাহিনীর এই সোনা-রূপায় মোড়া দরবার ও দরবারীদেরও হযরত রিবয়ী ইবনে আমের রা. সে নজরেই দেখছিলেন। কারণ যে আকীদায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, যে পয়গামের তিনি বাহক ছিলেন, যে ব্যক্তিত্বের তিনি অধিকারী ছিলেন এবং যে কুরআনের তিনি ঈমানদার-অনুসারী ছিলেন সে মহাসম্পদের মূল্য সম্পর্কে তিনি ছিলেন পূর্ণ সচেতন। তিনি গৌরবান্বিত ছিলেন ঐ গুণ ও বৈশিষ্ট্য, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সম্পদে, যার মর্যাদা ছিল এই অসার আড়ম্বর ও জৌলুসের চেয়ে অনেক বেশি। ফলে সভ্যতার আলোকচ্ছটা না তাঁর দৃষ্টিকে নিষ্প্রভ করতে পেরেছে, না তাঁর মনমস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করতে পেরেছে। তাঁর জানা ছিল, পারস্য সেনাপতি রুস্তম এক অগ্নিপূজারী। এরপর সে পূজারী তার সম্রাটের। পূজারী তার নিজের প্রবৃত্তি ও রীতি-নীতির। আর এ শুধু রুস্তমের হাল নয়, এক দু'জন আমীর বা সেনাপতির হাল নয়, এ তো এদের সকলের হাল। এমনকি সম্রাট ইয়াজদগির্দেরও একই অবস্থা। হযরত রিবয়ী জানতেন, এই নামের সম্রাট বাস্তবে অসংখ্য রীতি-নীতির দাস। সে তো দাস আপন দাসদেরও। এদের ছাড়া না সে নড়তে পারে, না এদের কাঁধে ভর করা ছাড়া আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ করতে পারে। সে কোনো অর্থেই মুক্ত স্বাধীন নয়। তার উপর প্রভুত্ব তার প্রবৃত্তির, তার রীতি-নীতির, তার আদত-অভ্যাসের, তার দৈহিক চাহিদার, পাশব-প্রবৃত্তির।

বন্ধুগণ!

আপনারা জানেন, সম্রাট ইয়াজদগির্দ ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের দুই সম্রাট– পারস্যের কিসরা ও রোমের কাইজারের একজন, যারা তৎকালীন সভ্য দুনিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছিল। ইসলামী জয়যাত্রার সমকালীন ইতিহাসের একজন মনোযোগী পাঠক হিসেবে আমার জানা আছে, পারস্য সাম্রাজ্য ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের চেয়েও বেশি বিস্তৃত ও শক্তিশালী। ভারতবর্ষের কিছু অঞ্চলও ইরানীদের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু এই প্রবল প্রতাপ-সম্রাট সম্পর্কে ইতিহাস বলছে, যখন তিনি রাজধানী মাদায়েন থেকে পলায়ন করছিলেন সেই জরুরি অবস্থাতেও তার সাথে ছিল এক হাজার পাচক! আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে– এক হাজার পাচক!? এবং এক হাজার গায়ক এবং এক হাজার চিতা ও বাজপাখির ব্যবস্থাপক! এরপরও তার আক্ষেপ ছিল– হায়! আমার দুর্গতি! এই অল্প ক'জন সেবক পরিচারক নিয়ে আজ আমি চলেছি! যেন তিনি বলছেন, লোকেরা! আমার প্রতি করুণা কর, আমার দুর্দশায় চোখের জল ফেল!

এই যার অবস্থা তাকে কি মুক্ত-স্বাধীন বলা যায়? ব্যক্তিত্ব ও সংকল্পের অধিকারী বলা যায়?

ইতিহাসে আরো আছে– এক পর্যায়ে তিনি যখন এক দরিদ্র বৃদ্ধার কৃপাপ্রার্থী হলেন, আর সে বৃদ্ধা তার চেহারা সুরতে আভিজাত্যের ছাপ লক্ষ্য করে দয়াপরবশ হয়ে তাকে খাবার দিল তখন তিনি বলতে লাগলেন, 'গান কোথায়? আমি তো গানের সুর ছাড়া আহার করতে পারি না!!'

চিন্তা করুন, এদের দাসত্ব ও দুর্বলতা, রীতি ও স্বভাবের মুখাপেক্ষিতা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল! যখন সে ক্ষুধার্ত, খাবারের প্রয়োজন, তখনও সে খাবার গ্রহণে অক্ষম, যদি না তাকে গান শোনানো হয়।

মনে পড়ছে, আহওয়াযের রাজা হুরমুযানের কথা, পারস্য সাম্রাজ্যের এই বড় রঈসকে গ্রেফতার করে যখন মদীনায় সাইয়েদুনা ওমর রা.-এর কাছে হাযির করা হচ্ছিল তখন তিনি মসজিদের ভূমিতে মাথার টুপিকে বালিশ বানিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। এদের পদশব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। হুরমুজানকে তাঁর সামনে হাযির করা হল। কথোপকথনের একপর্যায়ে হুরমুযান তৃষ্ণার্ত বোধ করে এবং পানি চায়। তাকে সাধারণ পেয়ালায় পানি দেওয়া হয়। সে তখন বলে ওঠে– পিপাসায় মারা গেলেও আমি এমন পেয়ালায় পানি পান করতে পারব না। এরপর তার পছন্দের পেয়ালা দেয়া হলে সে পানি পানে সক্ষম হয়। তার এই অহেতুক সংবেদন দেখে আমীরুল মুমিনীন তাঁর সঙ্গীদের দিকে তাকান– তারা যেন আল্লাহর প্রশংসা এবং নিআমতে ইসলামের শোকরগোযারি করেন যে, আল্লাহ তাদেরকে এই দাসত্ব, এই আরোপিত অবস্থার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত-স্বাধীন রেখেছেন। এই রীতি-নীতি, স্বভাব-সংবেদনের মূর্তি থেকে রক্ষা করেছেন, যা মানুষ নিজের হাতে নির্মাণ করে, এরপর নিজের উপর আরোপ করে।

মর্যাদা ও আভিজাত্যের নানা শর্ত আমরা নিজেরাই তৈয়ার করি, এরপর তা দ্বারা নিজেদের আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ করি। যেমন কাউকে অভিজাত হতে হলে তার বাড়িটা এই প্রকারের হতে হবে, গাড়িটা এই মানের হতে হবে, পোশাক-পরিচ্ছদ এই রকমের হতে হবে, জীবনযাত্রার এই সামগ্রী তার অধিকারে থাকতে হবে। আরো কত কি। যে যুগের গল্প বলছি ঐ যুগে অভিজাত পারসিক সমাজে কারো টুপির দাম যদি এক লক্ষ না হত তাকে লজ্জা দেয়া হত, আর যে 'আধা অভিজাত' তার টুপির মূল্য হত পঞ্চাশ হাজার। আমীর-উমারার কোমরবন্দের মূল্য ছিল পঞ্চাশ হাজার। এ সবই হচ্ছে নানা আরোপিত রীতি, যার পক্ষে আল্লাহ কোনো দলীল নাযিল করেননি।

বর্তমান ইউরোপীয় কৃষ্টি-কালচারও কি এজাতীয় নানা আরোপিত রীতি-নীতির সমষ্টি নয়? অর্থহীন শর্ত, মনগড়া পরিভাষা, অপ্রয়োজনীয় রীতি-নীতি ইউরোপিয়ানরা নিজেদের উপর আরোপ করেছে। তাদের অনুসারীরাও সেই ভার বহন করে চলেছে। কী এ সবের সূত্র? কেন এই স্বেচ্ছাবন্দিত্ব, যা আমরা বরণ করে নিয়েছি? এই সভ্যতার প্রভাবে আমরা সেই স্বাভাবিক মিতাচারী জীবন থেকে সরে এসেছি, যা ছিল আরবের বৈশিষ্ট্য এবং যা ধরে রাখতে উৎসাহ দিয়ে গেছেন ওমর ইবনুল খাত্তাবের মতো উম্মাহর শিক্ষক-মুরব্বীগণ!

রিবয়ী ইবনে আমের রা. ছিলেন স্বচ্ছ দৃষ্টি, মজবুত ঈমান ও গভীর ইলমের অধিকারী, যদিও জ্ঞান-সভ্যতার দাবিদারদের অনেকের কাছেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সেকেলে ও পশ্চাৎপদ। সেকারণেই পারসিকদের আরোপিত রীতি-নীতি তাঁর কাছে ছিল গলার বেড়ি ও পায়ের শৃঙ্খল, যা তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এইসকল রীতি-নীতি বিস্তারিত

না জানলেও যতটুকু তিনি জেনেছিলেন ও উপলব্ধি করেছিলেন তা-ও কম ছিল না, সাক্ষ্য ও মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট ছিল। এরই আলোকে তিনি তাদের দুনিয়ার প্রশস্ত জীবনের পয়গাম শুনিয়েছেন–

হে পারসিকেরা! প্রতারিত হয়ো না। এই অসার জৌলুস, এই আতশবাজির ঝলকানিতে হতবুদ্ধি হয়ো না। তোমরা তো বাস করছ এক আবদ্ধ পিঞ্জিরায়। আর পিঞ্জিরা তো সোনা-রূপার হলেও পিঞ্জিরা। অদৃশ্য কাঁচের হলেও পিঞ্জিরা। শহর-নগরের মতো প্রশস্ত হলেও পিঞ্জিরা। হে দার্শনিকেরা! কাকে বলে কারাগার! কেন তাকে বলে কারাগার? প্রশস্ত নয় বলে? তাতে অনেক কক্ষ থাকে না বলে? এমন শানদার কক্ষও তো থাকে অনেক কারাগারে, যা অনেক সাধারণজনের ঘর-বাড়িতেও থাকে না। তবুও তা কারাগার। আমাদের এখানে এই মজলিসে কেউ কি আছেন, যিনি কারাজীবন পছন্দ করবেন, যতই তাতে আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা থাকুক, যতই তা প্রশস্ত ও খোলামেলা হোক; যদিও তাতে থাকে বাগান ও জলাশয়, পার্ক ও মিউজিয়াম! মানুষ তো নিজের ঘরে নজরবন্দী হয়ে থাকতে চায় না। এ-ও তার কাছে এক আযাব।

আজকাল যাকে আমরা 'হীনম্মন্যতা' বলি এই আরব মর্দেমুমিনের মাঝে তার লেশমাত্রও ছিল না। ভীরুতা ও নতজানুতার অপচ্ছায়া থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত।

আজ যদি তিনি পশ্চিমা সভ্যতাকে দেখতেন এবং দেখতেন ঐ বিলাসী জীবন, যা আরবেরা ও বহু দেশের মুসলিমেরা যাপন করে চলেছে, তাহলে তাদের সম্পর্কেও তাঁর মূল্যায়ন তা-ই হত, যা হয়েছে রোম ও ফারিসের সম্পর্কে। এই জীবনধারার অনুসারীদের জন্যও তাঁর মনে জাগত অনুরূপ আক্ষেপ, যা জেগেছিল রোমক ও পারসিকদের জন্য। এদেরও তিনি দুনিয়ার সংকীর্ণ জীবন থেকে মুক্ত করার ঐরূপ আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করতেন, যেরূপ ফারিস ও রোমের ব্যাপারে করেছেন।

এই আরবী মর্দেমুমিন ঐ আযাদীর স্বাদ পেয়েছিলেন, যার সাথে তাকে পরিচিত করেছে ইসলাম। তাঁকে তুলে এনেছে আবদ্ধ শাসরুদ্ধকর পৃথিবী থেকে, যে পৃথিবী বস্তু ও উদরের, স্বার্থ ও প্রবৃত্তির, দাসত্ব ও প্রভুত্বের এবং যে পৃথিবী রোগ-শোক, জরা-ব্যধির ক্ষণস্থায়ী জীবনের পৃথিবী। এই সংকীর্ণ পৃথিবী থেকে তুলে এনে তাকে পরিচিত করেছে এক অসীম ভুবনের সাথে, যে ভুবন ঈমান ও বিশ্বাসের, যে ভুবন আত্মা ও হৃদয়ের, সহমর্মিতা ও পরার্থপরতার, সাম্য ও সুবিচারের, প্রীতি ও মমতার, বন্ধুত্ব ও নিঃস্বার্থতার; যে ভুবন লয়, ক্ষয়, জরাহীনতার; যেখানে আবিলতা নেই, বিকার ও বিকৃতি নেই, শঙ্কা ও বিষাদ নেই। তিনি এমন সময় এই মুক্তির স্বাদ উপভোগ করেছিলেন যখন রোম ও ফারিস তা থেকে বঞ্চিত ছিল। তাই ফারিস ও রোমের জীবন তাঁর কাছে মনে হয়েছে এক খাঁচাবন্দি জীবন, যে জীবনে আযাদ মুমিনের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। যেমন জলের মাছকে ডাঙায় তুললে, ডাঙায় তুলে রেশম-কোমল বিছানায় কিংবা সোনার রেকাবিতে রেখে দিলে মাছের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

প্রিয় সুধী!

এই হচ্ছে এক বেদুইন আরবের দৃষ্টি! এখন বলুন, হে আমার সংস্কৃতিমনা বন্ধুগণ! হে মহান শিক্ষকবৃন্দ! হে ভার্সিটির সম্মানিত প্রফেসরগণ! হে তালীম-তারবিয়াতের দিকপাল সুধিবৃন্দ! হে কলম-সৈনিক সমাজ! হে ইউরোপের পর্যটক সুশীল সমাজ! আমাকে বলুন কেমন আমাদের দৃষ্টি। কী আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সমকালীন অসার সভ্যতার প্রতি। এর কোনো তুলনা কি হতে পারে ঐ আরব বেদুইনের দৃষ্টির সাথে, যার ছিল না 'সংস্কৃতি'-জ্ঞান! যিনি জগৎকে তেমন করে জানতেন না, যেমন আমরা জেনেছি, যিনি পড়েননি ইতিহাস-বিজ্ঞান, যেমন আমরা পড়েছি। যিনি পরিচিত হননি জাতি-সম্প্রদায়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাথে, যেমন আমরা হয়েছি। দর্শন ও তার চুলচেরা বিশ্লেষণও ছিল তাঁর অজানা; অথচ এই সবই আমরা জেনেছি।

বন্ধুগণ!

এ সেই আরব মর্দেমুমিনের দৃষ্টি, ইসলাম ও ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার মনপ্রাণ পূর্ণ করে দিয়েছিলেন বিশ্বাস ও বীরত্বে, ক্ষণস্থায়ী জীবনের তুচ্ছতার চেতনা আর সত্যের গৌরবে। তাই তিনি বলতে সক্ষম হয়েছেন তৎকালীন পৃথিবীর প্রতাপশালী সেনাপতি 'রুস্তম'কে, যার নাম মানুষকে ভীত-কম্পিত করত, যিনি ছিলেন পারস্য সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় ব্যক্তি, তাকে সম্বোধন করে এই মর্দেমুমিন বলছেন গমগমে কণ্ঠে, প্রতাপ ছিল, প্রভাব ছিল, হে রুস্তম! দুর্ভাগা রুস্তম! পড়ে আছ দুনিয়ার জিন্দানখানায়! আর আমরা আরব মুসলিমেরা, যাদের দেহের মাত্র অর্ধেক আচ্ছাদিত, যাদের তরবারির খাপগুলো জরাজীর্ণ, যাদের পোশাক-পরিচ্ছদ শত ছিন্ন, পায়ের জুতা তালিযুক্ত আমরা আছি বেহেশতে, আর তোমরা আছ দোযখের অন্ধকূপে।

বন্ধুগণ!

কী তাঁকে এই দীপ্ত ভাষণে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল? জ্বী, তাঁর ঈমান ও বিশ্বাস, আপন পরিচয় ও মর্যাদায় পূর্ণ আস্থা! আর সেই শিক্ষা ও পয়গাম, যা দ্বারা আল্লাহ তাঁকে সৌভাগ্যবান করেছেন।

বন্ধুগণ!

আজ আমাদের কয়জন, বুকে হাত দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলুন, আমাদের ভার্সিটিগুলোর কয়জন, আমাদের অফিস-আদালত, আমাদের লাইব্রেরী ও গ্রন্থাগারের কয়জন, আমাদের শিল্প সংস্কৃতির, সাহিত্য-সাংবাদিকতার কয়জন আছি, যারা আজকের কোনো ইউরোপিয়ান কিংবা আমেরিকানকে সম্বোধন করার সাহস ও সক্ষমতা রাখি? যারা আমাদেরই রুটির টুকরোর উপর জীবনকে উপভোগ করে চলেছে! জ্বী, আমরাই তো সরবরাহ করে চলেছি তাদের 'খাদ্য'। এই 'পেট্রোল', আরব ভূমির এই 'তরল সোনা' যদি এই জাযীরা থেকে পশ্চিমের দিকে প্রবাহিত না হত, তাহলে বন্ধুগণ! না আমেরিকার এই পরাক্রম থাকত, না ইউরোপের এই জেল্লা।

ইউরোপ তো মিসকীন, রিক্তহস্ত; বিশ্বাসে, চরিত্রে, ব্যক্তিত্বে। সে এখন আক্রান্ত চারিত্রিক অবক্ষয়ের এক ব্যাপক মহামারীতে, যা তার সভ্যতাকে পরিণত করেছে এক পূতিগন্ধময় গলিত লাশে। না তার কাছে এর নিরাময়ের কোনো উপায় আছে, না নিয়ন্ত্রণের। বহু আগেই সে খ্রিস্টবাদ থেকেও হাত ধুয়ে ফেলেছে। ফলে আসমানের সাথে, নবুওত ও আখলাকের সাথে তার ক্ষীণ সূত্রটিও আজ ছিন্ন। এই হৃতসর্বস্ব সভ্যতার দিকে, এই পূতিগন্ধময় গলিত শবের দিকে ঘোলা চোখে তাকিয়ে আমরা ভাবছি, আহা! সে কত মহিয়ান! গরিয়ান! পূত-পবিত্র! ...সর্বশক্তিমান!! এরপর মুখ ঘুরিয়ে তাকাচ্ছি নিজের দিকে, নিজের দ্বীন-ধর্ম, আদর্শ ও সংস্কৃতির দিকে, রাজ্যের বিরক্তি ও তাচ্ছিল্য নিয়ে। এই গলিত শবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমরা গলে যাচ্ছি, মিলিয়ে যাচ্ছি, যেমন রৌদ্রের খরতাপে বস্তুর আর্দ্রতা হাওয়ায় মিলিয়ে যায় কিংবা রৌদ্রের প্রখরতা লেলিহান অগ্নিশিখার সামনে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

সেই আরব মুসলিম, যিনি তাঁর আত্মপরিচয়ের মর্যাদা উপলব্ধি করেছেন, আপন বার্তা ও পয়গামের মূল্য বুঝতে পেরেছেন, পারস্যের রাজ সেনাপতির সম্মুখে বলতে পেরেছেন–

আল্লাহুবতা'আছানা... আল্লাহ আমাদের

পাঠিয়েছেন...

ওয়াল্লাহ! এই বাক্য যদি পর্বতের উপর বর্ষণ করা হয়, পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, সমুদ্রের উপর বর্ষিত হলে এর সমুদয় পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। তাহলে যখন তা বর্ষিত হবে হৃদয় ও অন্তরের উপর, চিন্তা ও বিবেকের উপর!

এই সেই দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামী দাওয়াতের সোনালী যুগে যার অধিকারী ছিলেন মুসলিমেরা। বর্তমান গলিত সভ্যতার দিকেও আজ আমাদের এই স্বচ্ছ দৃষ্টিতেই তাকাতে হবে।

প্রিয় বন্ধুগণ!

এই কথাটিই আজ আমি বলে যেতে চাই, এই সুন্দর দৃষ্টিনন্দন নগরীতে, এই রাজধানী-শহরে, যা ছিল মরুর বুকে একটি সুন্দর ফুল, আর আজ তা এক উন্নত আধুনিক নগর। এখানেই আমি আপনাদের কাছে এই পয়গামটি আমানত রেখে যেতে চাই এবং সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত এই আওয়াজ পৌঁছে দিতে চাই। আজ আরব জাতির, পূর্ব-পশ্চিমের মুসলিমজাতির অনিবার্য প্রয়োজন, সেই মর্দে মুমিনের আলোকিত দৃষ্টি, যাতে আছে ঈমানের দ্যুতি, আত্মপরিচয়ের গৌরব। এই দীপ্ত দৃষ্টিতেই আজ তাকাতে হবে বর্তমানের গলিত সভ্যতার দিকে, যা আমাদেরকে চারপাশ থেকে বেষ্টন করে রেখেছে। আমরা তো অনাহূত অপজাত নই; পৃথিবীর বুকে ভাসমান কোনো জাতি নই, যাদের না আছে বংশ-পরিচয়, না কৌলিন্য-আভিজাত্য, না কীর্তি- অবদান, না ইতিহাস-ঐতিহ্য। না, না বন্ধুগণ! আমরা ধনী। আমরাই ছিলাম এই পৃথিবীর শিক্ষক। জাতি-সম্প্রদায়ের শিক্ষাগুরু। কিন্তু কেন আজ এই তিক্ত বাস্তবতা। নীতি ও কর্মে স্বাধীন এক জাতি কীভাবে পরাধীন হয়ে গেল? চালক কেন চালিত হল? 'শিক্ষক কেন ছাত্র হল?' মেযবান কেন অন্যের টেবিলের অনাহূত অতিথি হল?

আল্লাহ তাআলা আরব ঐতিহাসিকদের উত্তম জাযা দান করুন, যাঁরা এই অনির্বাণ বাক্য-শিখাটি সংরক্ষণ করেছেন, যাতে আছে ঈমানের জ্যোতি, প্রথম যুগের আরবীয় ব্যক্তিত্বের দ্যুতি, আল্লাহ যাদের ইসলামী শিক্ষার চিরন্তন আলোয় আলোকিত করেছিলেন এবং যাঁরা এর মর্যাদা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। এতেই তাঁরা সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত ছিলেন। একেই তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করতেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, যা কিছু এই উৎস থেকে উৎসারিত নয় এবং যা কিছু এর সাথে যুক্ত নয় তার কোনো স্থিতি নেই, স্থায়িত্ব নেই, মূল্য নেই, মর্যাদা নেই।

বর্তমান চিন্তা, দর্শন ও তার চ্যালেঞ্জসমূহের মোকাবিলায় আজ আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে এক সাহসী সুঠামদেহী বীর পুরুষের মত, যে সচেতন নিজের শক্তি ও মর্যাদা সম্পর্কে, গৌরবান্বিত নিজের বার্তা ও ব্যক্তিত্বে; যে তার প্রতিভার ব্যবহারে কুশলী, গ্রহণ-বর্জনে স্বাধীন, বর্তমান সভ্যতা থেকে সে ঐটুকু গ্রহণ করে, যা তার জন্য উপকারী, তার আদর্শ- উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যা তাকে নব শক্তিতে বলীয়ান করে, তাকে ঘুন পোকার মতো তিলেতিলে নিঃশেষ করে দেয় না।

তার অবস্থা কখনো ঐ খর্বাকৃতি বামুনের মতো হবে না, যে তার আস্থা ও ঈমান হারিয়ে ফেলেছে, অপচ্ছায়া ও জুজুর ভয়ে যে গুটিয়ে যায়, আরো ক্ষুদ্র হয়ে যায়, যে প্রাণপণে শুধু বেঁচে থাকতে চায়, কিছুতেই মরতে চায় না। বিপদ ও বিজয়ের চ্যালেঞ্জ থেকে, স্বকীয়তা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্র হতে, নেতৃত্ব ও ইমামতের ময়দান থেকে যে শুধু পালিয়ে বেড়ায়। যে এই অন্তসারশূন্য সভ্যতার দিকে এমন প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে তাকায় যেমন পাহাড়ের পাদদেশে দণ্ডায়মান কোনো শিশু পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকিয়ে থাকে আর মনে মনে ভাবে, আহা! আমি যদি ওখানে উঠতে পারতাম!

প্রিয় উপস্থিতি!

আজকের এই বক্তৃতা আমি সমাপ্ত করতে চাই, শায়েরে ইসলাম আল্লামা ইকবালের একটি পংক্তি দিয়ে। যেখানে তিনি সম্বোধন করেছেন উম্মাহর শিক্ষিত যুবসমাজকে, পশ্চিমা সভ্যতা যাদের মনমস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। ফলে তাদের দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে গেছে তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মপরিচয়, তার ব্যপ্তি ও গভীরতা, তার সুপ্ত ও সুষুপ্ত যোগ্যতা। ফলে সে 'বস্তু'র প্রেমে আত্মহারা হয়েছে এবং মৃত্যু-ভয়ে ভীত। তিনি বলেছেন–

হে মুসলিম! ধিক! তোমার সামনে উন্মোচিত হয়েছে দিগ-দিগন্ত, কিন্তু হারিয়ে গেছে তোমার আপন ব্যক্তিত্ব। আর কতকাল তুমি থাকবে মূর্খ-উদাসীন? উদভ্রান্ত, কর্মহীন? তুমি তো এক প্রাচীন আলো। কাজেই অপসারিত কর রাতের আঁধার। তোমার আস্তিনে রয়েছে 'শুভ্রহস্ত'। তা দ্বারা সাধন কর 'কালীম-কর্ম'। তুমি আজ অঙ্কন করছ এক সংকীর্ণ পৃথিবীর ছবি। অথচ তুমি এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এর চেয়ে অগ্রসর। তুমি ছিলে, সে ছিল না; আর তুমিই থাকবে সে থাকবে না।

হে 'চিরজীবী' ইনসান!

মৃত্যুকে ভয় পাও? মৃত্যুরই তো তোমাকে ভয় পাওয়ার কথা! তুমিই না ওঁৎ পেতে থাকতে তার প্রতীক্ষায়! শোনো, পরম দাতা যখন কিছু দান করেন তা ছিনিয়ে নেন না, ফিরিয়েও নেন না। জেনে রেখো, 'মৃত' সে নয়, যে প্রাণ হারিয়েছে। 'মৃত' সে, যে ঈমান হারিয়েছে। •

[অনুবাদে : **মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ**]

পত্র ৩

হিজাযের মর্যাদা, স্বাতন্ত্র্য ও তা রক্ষার অপরিহার্যতা

(আমীর ফয়সাল বিন আব্দুল আযীযের উদ্দেশে)

হজ্ব-ওমরার উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন ইলমী ও পরামর্শ-মজলিসে অংশগ্রহণের জন্য এই লেখকের বারবার সৌদি আরবে যাওয়া হয়। কিছু সূত্রে সংবাদ পেলাম, সৌদি আরবের উন্নতি-অগ্রগতি ও নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির শিরোনামে আধুনিক প্রযুক্তি ও বিনোদনব্যবস্থা বিস্তারের লক্ষ্যে এবং প্রতিবেশী উন্নত আরব দেশগুলোর অনুকরণে পশ্চিমা সংস্কৃতির কিছু কিছু বিষয় অবলম্বন করা যায় কি না– এ বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। এর পেছনে আরব তরুণ-প্রজন্মের বর্তমান অস্থিরতা নিরসন এবং মিসরের সাংবাদিকতার প্রভাব ও গণমাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন বিনোদন প্রোগ্রামের কারণে উদ্ভূত আশঙ্কা রোধের চিন্তা কার্যকর। এই চিন্তা-ভাবনা ও সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে এই লেখক পুরোপুরি নিশ্চিত হতে না পারলেও বিষয়টি তাকে শঙ্কায় ফেলে দেয় এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের সাথে আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

সৌভাগ্যক্রমে এ সময় মামলাকার ওলীয়ে আহ্দ ও উযীরে আ'যম আমীর ফয়সাল মদীনা মুনাওয়ারায় আসেন। সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাঁর সাথে সাক্ষাত ও একটি একান্ত মজলিসের অনুমতি প্রার্থনা করি, যে মজলিসে আমার সফরসঙ্গী ছাড়া আর কেউ উপস্থিত থাকবেন না।

তিনি আমার ইচ্ছা গ্রহণ করেন এবং পূর্ণ ধৈর্য্য ও মনোযোগের সাথে আমার বক্তব্য শোনেন। আমার কথার মাঝে একবারের জন্যও কথা বলা থেকে বিরত থাকেন। (উমারা-উযারা তো দূরের কথা, সাধারণ আমলা- অফিসারদের কাছেও তো এর

প্রত্যাশা করা যায় না।)

মনে রাখার সুবিধার্থে আমি একটি লিখিতপত্রও প্রস্তুত করে নিয়েছিলাম, যা তাঁকে এই মজলিসেই পাঠ করার অনুরোধ করি। তিনি লেখাটি আমার কাছ থেকে নিয়ে আমার সামনেই তা পাঠ করেন।

এরপর আলাপচারিতার মধ্যে কিছু কথার ব্যাখ্যা জানতে চান এবং কিছু সংশয়ের নিরসনও করেন। তিনি বলেন, মামলাকা হারামাইনকে এক মহান আমানত মনে করে এবং নিজেকে এই আমানতের দায়িত্বশীল ও তা পালনে নিজের মধ্যে পূর্ণ হামিয়্যাত পোষণ করে। ইসলামের শিক্ষা ও বিধান এবং আকাইদ ও আখলাক-বিরোধী কার্যকলাপ সে কিছুতেই অনুমোদন করবে না। ব্যক্তিগতভাবেও তিনি এই পবিত্রভূমিকে উম্মাহর চোখের তারা ও হৃদয়ের স্পন্দন বলেই বিশ্বাস করেন এবং এই ভূমির বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের উদ্বিগ্ন হওয়ার এবং দায়িত্বশীলদের উপদেশ ও নির্দেশনা দানের অধিকারও গভীরভাবে উপলব্ধি করেন।

এই সাক্ষাতের পর লেখকের অনেকবার সেই পবিত্র ভূমিতে যাওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে নানাবিধ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। ভেতর-বাহিরের বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে সৌদি হুকুমতও তাৎক্ষণিক পরিবর্তনের পথে চলতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীলদের সাথে আবারো যোগাযোগের প্রয়োজন অনুভব করি, বিশেষত আমীর ফয়সালের সাথে। যিনি ঐ সময় মামলাকার ওলিয়ে আহ্দ (ক্রাউন প্রিন্স), উযীরে আ'যম ও হিজাযে বাদশাহের নায়েব ছিলেন। নিম্নোক্ত পত্রটি তাঁরই উদ্দেশে ১৩৮১ হিজরীর কাছাকাছি কোনো এক সময় লেখা হয়]

সম্মানিত যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী! (হাফিযাহুল্লাহু তাআলা ওয়া রাআহু)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ তাআলা আপনার উপর তাঁর দানসমূহ কায়েম-দায়েম রাখুন, তাঁকে রাজিখুশি করে এমন কাজের তাওফীক দান করুন, যা উম্মাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করবে এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম যা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

জনাবওয়ালা!

আপনি জানেন, এই দেশ আর দশটি দেশের মতো নয়, যাকে শিক্ষা-দিক্ষা, নাগরিক সেবা, রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ও জনমত প্রভাবিত করার জন্য পূর্ব-পশ্চিমের কোনো দেশের দিকে তাকাতে হবে। এটা তো ঐ রাষ্ট্র, যার সম্পর্কে আল্লাহর ইরাদা ও ফয়সালা এই যে, তা হবে ইসলামের রাজধানী, দ্বীনের দুর্গ ও মুসলমানদের হৃদয় ও আত্মার প্রশান্তির স্থল। এই দেশ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমানত। তাঁরই আবির্ভাবের বদৌলতে তা অন্ধকার থেকে আলোতে এসেছে। অজ্ঞাতবাসের গুহা থেকে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির রৌদ্রালোকিত ভুবনে উঠে এসেছে। ইতিহাসের আস্তাকুড় থেকে দুনিয়ার মারকাযিয়্যাতের সুউচ্চ মাকামে উপনীত হয়েছে। আরবী ভাষা ও সংস্কৃতি আজ প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, অসংখ্য জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে, সুদীর্ঘ কাল ধরে। সুতরাং এখানে আছে দ্বীন-ধর্ম, আমানত ও শরাফতের প্রশ্ন, আছে ইতিহাসের বাস্তবতার প্রতি মান্যতা ও মুসলিম-জাহানের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা ও মূল্যায়নের প্রশ্ন। আছে প্রজ্ঞাপূর্ণ রাজ্যচালনারও প্রশ্ন। এই সবকিছুর দাবি হচ্ছে, এখানে যে নীতি ও বিধান প্রণীত হবে, যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রীয় পলিসি নির্ধারিত হবে, যে জীবন-ধারা গৃহীত হবে তাতে প্রতিফলিত হতে হবে এই দেশ ও রাষ্ট্রের স্বকীয়তা, আন্তর্জাতিকতা এবং এর চিরন্তন বার্তা ও পয়গাম। এর উসূল-আকাইদের পরিপন্থী সকল বিষয় থেকে এবং এমন সকল পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে হবে, যা হবে এর মর্যাদা ও বিশিষ্টতায় কালিমা লেপনের শামিল। সেসবের দ্বারা এই দেশ ও তার নাগরিকদের বস্তুগত ও সুযোগ-সুবিধাগত উন্নতি সাধিত হলেও। কমিউনিস্ট রাশিয়া ও পুঁজিবাদী আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কেরা তাদের রাষ্ট্র ও মতাদর্শের জন্য যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করেছে এই দেশ ও তার নেতৃবৃন্দকে আপন বিশ্বাস ও আদর্শের জন্যে এর চেয়েও বেশি ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। ওরা তো ওদের মতাদর্শ বিরোধী, তাদের গৃহীত জীবনদর্শন ও জীবনধারা পরিপন্থী ক্ষুদ্রতম কোনো কিছুও অনুমোদন করেনি। তা দ্বারা বৃহৎ কোনো বস্তুগত স্বার্থ হাসিল হলেও।

একটি মহল মনে করে, সুখী ও আয়েশী জীবনযাত্রার ব্যবস্থা ও উপকরণ গ্রহণে, পশ্চিমপন্থী সভ্য দুনিয়ার অনুকরণে, স্বাধীন প্রচারমাধ্যম, বিধিনিষেধহীন অবাধ অনুষ্ঠানমালা ও পশ্চিমা লাইফ-স্টাইল অবলম্বনে (যার সাথে দেশের প্রকৃত উন্নতি-অগ্রগতির কোনো সম্পর্ক নেই) দোষের কিছুই নেই। এতে বরং জনসাধারণের উদ্বেগ-অস্থিরতা দূর হয় এবং তারা ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার চিন্তা-ভাবনা থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়। (কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন) আমি ইতিহাস ও বাস্তবতার আলোকে এই চিন্তাধারার সাথে একমত নই। আমার মতে, এটা কোনো সমাধান নয়। সমুদ্রের নোনা পানি তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা মেটায় না, তা আরো তীব্র করে দেয়।

এক্ষেত্রে সঠিক সমাধান হচ্ছে, ইসলামের সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা, দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি, হালাল-জীবিকার সহজলভ্যতা, স্বাবলম্বিতা ও কর্মসংস্থানের বিস্তার, নতুন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সুলভমূল্য এবং বৈধ ও নির্মল বিনোদনের পর্যাপ্ততা, যার ক্ষেত্র মোটেই সীমাবদ্ধ নয়, যেমনটা শরীয়ত ও মানব স্বভাবের ব্যাপারে অজ্ঞ লোকদের ধারণা।

যে কোনো রাষ্ট্রেরই এক বড় বিপদ হচ্ছে, অন্ধ অনুকরণ ও অপরিণত চিন্তা, যা যে কোনো প্রকারের চিন্তা ও দর্শনের তোড়ে ভেসে যায়, কিছুমাত্রও মোকাবিলা করতে পারে না এবং যা সর্বপ্রকার প্রচার-প্রপাগাণ্ডা ও দাবি-দাওয়ার সম্মুখে নতি স্বীকার করে। এই প্রবণতা যে কোনো জাতি ও রাষ্ট্রের জন্যেই বিপদ। এটি কিছুকালের মধ্যেই অনাচার, অসহিষ্ণুতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের বিস্তার ঘটাতে পারে। বহু দেশ এর শিকার হয়েছে এবং সেসব অঞ্চলের নেতৃত্ব অবশেষে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছে।

এই প্রবণতা এই পবিত্র ভূমির শান-শওকত, এর স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তাকে দুর্বল করে দিবে, আপন সোনালী অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে এবং এই পবিত্র ভূমি ও তার নেতৃত্ব আর আল্লাহর রহমত ও নুসরতের মাঝে দেয়াল তুলে দিবে। এই নাযুক যামানায় তো, যখন দুশমন অতি ধুরন্ধর ও শক্তিশালী, পদে পদে আল্লাহর মদদ ও নুসরতের প্রয়োজন, যা ছাড়া কোনোরূপ বিজয়, মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রত্যাশা সম্পূর্ণ অমূলক।

এই দেশও যদি এই পথে চলা শুরু করে, যার মন্ত্রনা কেউ কেউ দিচ্ছেন; এবং মিসর, সিরিয়া ও লেবাননের মতো অবাধ স্বাধীনতা, শরীয়ত ও আখলাকের সীমা বহির্ভূত ভোগ-বিলাসের পথ অবলম্বন করে, তদ্রূপ অন্যান্য আরব দেশের দেখাদেখি এই দেশও 'আরব জাতীয়তাবাদ'কে গ্রহণ করে এবং আর দশটা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের কাতারে নেমে আসে, যাদের না আছে কোনো স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা, না দাওয়াত ও পয়গাম, তাহলে এই দেশও ঐ রকম আর দশটা দেশের মতোই একটা দেশে পরিণত হবে, যার না

পৃথিবীর জাতিপুঞ্জের মাঝে আলাদা কোনো বিশেষত্ব থাকবে, না মানুষের হৃদয়ে কোনো সম্মানের স্থান। (আল্লাহ হেফাযত করুন) শুধু তাই নয়, এর দ্বারা শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী দায়ী, মুজাহিদ ও মুসলিমজনতার ত্যাগ-তিতিক্ষাকে নস্যাৎ করে দেওয়া হবে, যা তাঁরা ইসলামের খাতিরে বরণ করেছেন।

এমন একটি দেশ ও জাতির বিশেষ কী মর্যাদা থাকতে পারে, যারা শুধু ভোগ করে বেড়ায়, পশু-পাখীর মতো উদরপূর্তি করে, এরপর কীটপতঙ্গের মতো মরে যায়, যাদের কোনো বার্তা ও পয়গাম থাকে না, নীতি ও বিশ্বাস থাকে না, স্বাতন্ত্র্য ও নৈতিকতা থাকে না এবং যারা মুসলিমজাহানের তরফ থেকে প্রাপ্ত সম্মান ও মর্যাদা বিসর্জনের সাথে সাথে পশ্চিমা দুনিয়ার কাছেও আপন স্বকীয়তা ও ঐতিহ-াসিক মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে দেয়, যা একটুখানি সাহস ও সদিচ্ছার দ্বারা, একটুখানি ত্যাগ ও কোরবানীর দ্বারাই বহাল রাখা যেত! এটা তো ভীরুতা ও নতজানুতার এমন নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, যা থেকে এই উন্নত রাষ্ট্রের কর্ণধারদের আমি অনেক উর্ধ্বের বলে মনে করি।

আমি এমন এক ইনসান হিসেবে যে আপন দ্বীন ও ঈমান, জ্ঞান ও সংস্কৃতি বরং ইনসানিয়াত ও মনুষ্যত্বের জন্যও এই ভূমিরই কৃপাধন্য, আপনাকে আপনার উন্নত দৃষ্টি, দৃঢ় মনোবল ও উচ্চ যোগ্যতার দোহাই দিচ্ছি, যে পদ-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন তা ব্যবহার করুন। ব্যক্তি ও সমাজজীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশকারী এই আশঙ্কার মোকাবেলা করুন এবং আরব ও মুসলিম দেশগুলোর স্বকীয়তা রক্ষার জন্য, সাহিত্য-সাংবাদিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির চর্চাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যবহার করুন, যার দ্বারা এই জাতি, বিশেষত নতুন প্রজন্মের মন-মস্তিষ্কে দ্বীনী ও ঈমানী জযবা, ইসলামী গাইরত ও হামিয়্যাত পয়দা হবে; হুসনে আখলাক ও সচ্চরিত্রের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং পাপচার ও মন্দ স্বভাব-চরিত্রের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে। এভাবে তাদের চারিত্রিক শুদ্ধি ও মন-মস্তিষ্কে ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে ঐ মহান দায়িত্বভার গ্রহণের যোগ্য করে তুলুন, যার প্রত্যাশা গোটা দুনিয়ার মুসলমান তাদের সম্পর্কে লালন করে। দাওয়াত ও জিহাদের যে ক্ষেত্র ও সুযোগ আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন তা সবসময়, সব জায়গায় সবাইকে দেওয়া হয় না।

کہ آتی نہیں فصل گل روز روز

'ফুল ও বসন্ত প্রতিদিন আসে না।'

আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে দৃঢ় প্রত্যাশা রাখব, আপনি এই সুযোগকে গনীমত মনে করবেন এবং আপনার বার্তা ও বিশ্বাসকে কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করবেন। এই পবিত্র ভূমি তার চারপাশের পরিবর্তন ও ঘটনাধারা এবং আভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ও চিন্তার বিক্ষিপ্ততার কারণে ইতিহাসের অতি নাযুক ও কঠিন সময় অতিক্রম করছে। এখন এক একটি মুহূর্তের গুরুত্ব মাস ও বছরের সমান। ভুল গন্তব্যের দিকে একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপও এই দেশ ও জাতিকে এত দূরে নিয়ে যেতে পারে যেখান থেকে তার ফিরে আসা কঠিন হয়ে পড়বে।

পরিশেষে এই স্পষ্ট ভাষণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। এই দেশ ও দেশের কর্ণধারদের প্রতি খুলূস ও কল্যাণকামিতা, আরব ও মুসলমানদের জন্যে মর্যাদা, নিরাপত্তা, নেতৃত্ব ও ইমামতের শুভকামনাই আমাকে স্পষ্টভাষণে উদ্বুদ্ধ করেছে। •

[অনুবাদে : মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ]

আল্লাহকে ভয় করুন, সুদকে না বলুন

মাওলানা আহমদ মায়মুন

বর্তমানকালে সুদ সম্পর্কিত লেনদেন ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি বিরাট অংশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। বড় আকারের প্রায় সকল ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভরশীল হয়ে গেছে সুদী লেনদেনের উপর। এ কারণে সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাগুলো যখন সামনে আসে তখন তা বুঝতে, বুঝাতে এবং মেনে নিতে অনেকের মনে দ্বিধা-সংশয়ের সৃষ্টি হয়। অনেকে এক্ষেত্রে নানা রকম কৌশলের আশ্রয় নিতে চেষ্টা করেন। এটা কোনো মুমিন-মুত্তাকীর জন্য আদর্শ পন্থা নয়। সুতরাং সকলের উচিত আল্লাহ তাআলার ভয়কে মাথায় রেখে পরকালের কথা চিন্তা করে ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করা, এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা শিরোধার্য করে নিয়ে নিজেদের কর্মজীবনের গতিপথ নির্ণয় করা এবং পরকালের পথ সুগম করা।

আরবী ভাষায় সুদের প্রতিশব্দ রিবা। বাংলাভাষায় 'সুদ' শব্দটি যেমন সুপরিচিত, তেমনি আরবী ভাষায়ও 'রিবা' শব্দের ব্যবহার বহুলপ্রচলিত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওত লাভ এবং কুরআনে কারীম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবের জাহেলী যুগেও 'রিবা' শব্দটি প্রচলিত ছিল। শুধু তাই নয়, সে সময় রিবা অর্থাৎ সুদের লেনদেনও চালু ছিল। সূরা নিসার আয়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা আ.-এর যুগেও ইহুদীদের মধ্যে সুদের লেনদেনের রেওয়াজ ছিল এবং মূসা আ.-এর নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থ তাওরাতেও 'রিবা' অর্থাৎ সুদের লেনদেনকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সুতরাং যে শব্দটি প্রাচীনকাল থেকে আরব ও তার আশপাশের এলাকায় পরিচিত ছিল এবং সে অনুযায়ী লেনদেনের রেওয়াজ ছিল, পবিত্র কুরআনে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করার পাশাপাশি এ কথাটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূসা আ.-এর উম্মতের জন্যও রিবা তথা সুদ হারাম করা হয়েছিল; তাই তা এমন কোনো বিষয় নয়, যা কুরআন নাজিল হওয়ার সময় সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে বুঝা বা বুঝানো কঠিন ছিল। তারা সকলেই রিবার হাকীকত বুঝতেন। তাদের কাছে একথা স্পষ্ট ছিল–

كل قرض جر نفعا فهو ربا.

(যে ঋণ ঋণদাতার জন্য কোনো ধরনের মুনাফা বয়ে আনে সেটাই রিবা।)

এ কারণে অষ্টম হিজরীতে সূরা বাকারার রিবা সম্পর্কিত আয়াতগুলো যখন নাযিল হয় তখন সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে রিবা'র নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক বিধান বুঝতে এবং মেনে নিতে কোনোরূপ বেগ পেতে হয়নি। মদ্যপানের প্রতি নিষেধাজ্ঞা যেমন তাঁরা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন, তেমনি রিবা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা নাজিল হওয়ার পর তাও তাঁরা অকপটে মেনে নিয়ে সবধরনের সুদী লেনদেন ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ইসলাম রিবা'র নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিকে কেবল নৈতিক বিবেচনার অধীনে রাখেনি; বরং তাকে পুরোপুরি আইনের মর্যাদা দিয়েছে। এ বিষয়ে বিদায় হজ্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহাসিক ভাষণের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। নবীজী বলেছেন–

أَلَا كُلّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيّةِ تَحْتَ قَدَمَيّ مَوْضُوعٌ، ... وَرِبَا الْجَاهِلِيّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، فَإِنّهُ مَوْضُوعٌ كُلّهُ.

সাবধান! জাহেলিয়্যাতের প্রত্যেক বিষয় আমার দু'পায়ের নীচে।... জাহেলীযুগের 'রিবা' বাতিল। আর প্রথম রিবা, যা আমরা বাতিল করছি তা আমাদের রিবা; আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের রিবা। তা পুরোটাই বাতিল। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১২১৮

বর্তমান পৃথিবীতে দু'ধরনের সুদী লেনদেন বেশি প্রচলিত। এক. মহাজনী সুদ, অর্থাৎ কেউ কোনো সাময়িক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কারও নিকট থেকে ঋণ নিলে এর বিপরীতে ঋণের অতিরিক্ত যে অর্থ নেওয়া হয়। দুই. বাণিজ্যিক সুদ, যা কোনো উৎপাদনমূলক কাজে গৃহীত ঋণের বিপরীতে নেওয়া হয়। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা– সর্বপ্রকার সুদ হারাম। কেউ কেউ প্রতারণা করে বলে থাকেন যে, পবিত্র কুরআনে যে 'রিবা' তথা সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তার দ্বারা প্রথম প্রকারের সুদ অর্থাৎ মহাজনী সুদ উদ্দেশ্য, যা কোনো সাময়িক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গৃহীত ঋণের বিপরীতে নেওয়া হয়। তারা এই ধোঁকার ভিত্তি রেখেছে আরেক মিথ্যা দাবির উপর। তারা বলে, কেবল এ ধরনের সুদই নাকি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এবং পূর্ববর্তী জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল। তাই এরূপ সুদকেই কুরআনে কারীমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমান যুগে প্রচলিত বাণিজ্যিক সুদ (commercial intarest)-এর রেওয়াজ এবং লেনদেন নাকি সে যুগে ছিল না। সুতরাং তাদের ধারণা মতে এরূপ সুদ কুরআনে কারীমে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

আসলে বিষয়টি এমন নয়। প্রথমত এ ধারণা ঠিক নয় যে, রিবা'র যে পদ্ধতি জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল না, তা হারাম নয়। কেননা, ইসলাম যখন কোনো জিনিসকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করে তখন তার একটি নির্দিষ্ট পরিচয় থাকে। সেই পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে শরীয়তের বিধান আরোপিত হয়। নিছক পন্থা-পদ্ধতি পরিবর্তন হওয়ার কারণে বিধান পরিবর্তন হয় না। উদাহরণত কুরআনে কারীমে মদকে হারাম করা হয়েছে। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় মদ প্রস্তুত করার যেসব পন্থা-পদ্ধতি ছিল তার সবই হয়ত পরিবর্তিত হয়ে গেছে, কিন্তু মদ তো ঠিকই রয়ে গেছে, তাই মদ হারাম হওয়ার বিধানও বদলায়নি। এমনিভাবে অশ্লীল কর্মকাণ্ড কুরআন নাযিল হওয়ার সময় একরকম ছিল, বর্তমানকালে তার ধরন অনেক পাল্টে গেছে, তবু অশ্লীলতার নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। সুদ জুয়া'র অবস্থাও তাই। এখন যদি সুদকে আধুনিক ব্যাংকিং অর্থব্যবস্থা বলে এবং জুয়াকে লটারী বলে বৈধ মনে করা হয় তাতে তো শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলোকে বৈধ বলা যাবে না।

একবার নাকি কোনো ভারতীয় নামকরা সঙ্গীতশিল্পী এক আরব বেদুইনের গান শুনে বলেছিল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের গান শোনার কারণেই গানকে হারাম বলেছেন। এরূপ বেসুরো গান হারাম হওয়ারই কথা। আমাদের গান শুনলে কখনও তিনি গানকে হারাম বলতেন না।

কুরআনে কারীমে বর্ণিত সুদের নিষেধাজ্ঞাকে জাহেলী যুগের প্রচলিত বিশেষ কোনো সুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করাও ঠিক এমনই।

এছাড়া কমার্শিয়াল ইন্টারেস্ট বা বাণিজ্যিক সুদ জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল

না– এমন নয়; বরং তখনও এধরনের বাণিজ্যিক সুদ লেনদেনের রেওয়াজ ছিল। সেযুগে সমাজের বড় বড় ব্যবসায়ীরা সুদভিত্তিক লেনদেনে বর্তমানকালের ব্যাংকের মতো ভূমিকা পালন করত। এছাড়া এক গোত্রের ব্যবসায়ীরা নিজ গোত্রের বা অন্য গোত্রের ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে মোটা অংকের সুদী ঋণ নিয়ে ব্যবসার কাজে খাটাত। কখনও বা সুদী ঋণ নিয়ে ফসল উৎপাদনের কাজে লাগত। হাদীস ও তাফসীরের বিভিন্ন কিতাবে আছে, আম্র ইবনে আওফের গোত্র মুগীরার গোত্রের নিকট থেকে ঋণের বিপরীতে সুদ গ্রহণ করত আর মুগীরার গোত্র তা পরিশোধ করত। এভাবে জাহেলী যুগে তাদের লেনদেন চলত। ইসলামের আগমনের পরও মুগীরার গোত্রের কাছে আম্র-এর গোত্রের মোটা অংকের সুদ পাওনা ছিল (যা বাতিল করা হয়েছিল)।

উক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এসব সুদী লেনদেন মূলত ব্যক্তিগত পর্যায়ের কোনো অভাব বা অর্থসংকটের কারণে ছিল না, যাকে 'মহাজনী সুদ' নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলো ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সুদী লেনদেন।

এছাড়া তখনকার আরবের লোকেরা কখনও গোত্রের সাধারণ মানুষের অর্থকড়ি এক জায়গায় একত্র করে সেগুলো ব্যবসার কাজে লাগাত। বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনে যে কাফেলার বিষয়টি ছিল, সেটিও ছিল একটি ব্যবসায়ী পণ্য আমদানিকারক কাফেলা। সে ব্যবসায় কুরায়শের সকল মানুষের অর্থ লগ্নি করা ছিল।

সহীহ বুখারীতে আছে, হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম সে যুগের বেশ বড় ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর আমানতদারির সুনামও ছিল সবার কাছে প্রসিদ্ধ। এজন্য অনেকে তাঁর কাছে অর্থ আমানত রাখতে আসত। তিনি সেগুলো আমানত হিসাবে না রেখে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করতেন, যাতে মালিকের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। এরপর তিনি এসব অর্থ নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতে খাটাতেন। ইনতেকালের সময় তাঁর কাছে মানুষের প্রাপ্য ঋণ ছিল বাইশ লক্ষ দেরহাম। তখনকার সময়ের হিসাবে এ পরিমাণ অর্থকে ছোটখাটো পুঁজি বলা যায় না। এসব ঋণ তাঁর ইনতেকালের পর তাঁর রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদ থেকে পরিশোধ করা হয়েছিল। এগুলো ছিল মূলত তাঁর ব্যবসায়িক ঋণ। সুতরাং এ কথা বলা যে, সে যুগে ব্যবসায়িক ঋণের রেওয়াজ ছিল না– ঠিক নয়।

এ ছাড়া আরও অনেক নজির ইতিহাসে পাওয়া যায়। অতএব কুরআনে কারীমে সুদের প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা সর্বপ্রকার সুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এখন আমরা দেখি, সুদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কারীমের ভাষ্য–

প্রথম আয়াত :

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَ اَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই। আর তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। –সূরা বাকারা (২) : ২৭৫

দ্বিতীয় আয়াত :

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ.

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। –সূরা বাকারা (২) : ২৭৬

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সুদ থেকে অর্জিত অর্থ বা তার বরকত নষ্ট করে দেন। আর সদকা দানকারীর অর্থ-সম্পদ বা তার বরকত বৃদ্ধি করে দেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াত :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও।

যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা (কারও প্রতি) জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। –সূরা বাকারা (২) : ২৭৮-২৭৯

পঞ্চম আয়াত :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। –সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৩০

এ আয়াতে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, কুরআন নাজিল হওয়ার সময় আরবে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। তা দূর করার জন্য এ আয়াতে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। তার মানে এ নয় যে, চক্রবৃদ্ধি আকারে না হলে সুদ খাওয়া হালাল হয়ে যাবে। কারণ, অন্যান্য আয়াতে তো যে কোনো রকমের সুদ খাওয়াকে হারাম করা হয়েছে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াত :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَّ اَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَ قَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا.

ভালো ভালো যা ইহুদীদের জন্য বৈধ ছিল আমি তা তাদের জন্য অবৈধ করেছি; তাদের সীমালংঘনের জন্য, আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেওয়ার জন্য এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল; এবং অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। –সূরা নিসা (৪) : ১৬০-১৬১

উক্ত দুই আয়াতে ইহুদীদের যেসকল অপরাধের কারণে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে একটি ছিল তাদের সুদ গ্রহণের অপরাধ। এটা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, তবু তারা সুদ গ্রহণ করত। তাই তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

এরপর সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হচ্ছে :

এক. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ... وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ...

(বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়)

আমাদের দ্বীনের রুচি ও বৈশিষ্ট্য

মাওলানা সায়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদাভী রাহ.

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

৬. দ্বীনের চেতনা ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় এই বিষয়টিও পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম যে কওম ও জাতির প্রতি প্রেরিত হন, বিশেষত খাতামুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, সেই উম্মতের সাথে তাঁদের সম্পর্কের স্বরূপ কী। তাঁদের সম্পর্ক ডাকপিয়নের মতো নয়, যার দায়িত্ব শুধু সঠিক ঠিকানায় ডাক পৌছে দেওয়া, এরপর ঐ লোকদের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তেমনি যাদের কাছে ডাক পাঠানো হয়েছে তাদেরও এই ডাক-বাহকের সাথে কোনো কাজ নেই। নিজেদের ইচ্ছা ও কর্মে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন–এমন নয়।

নবী ও উম্মতের সম্পর্ককে নিতান্তই সাময়িক ও আইনী সম্পর্ক মনে করা, তাঁদের জীবনাদর্শ ও জীবনধারা, তাঁদের চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি এবং তাদের ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে উম্মতের আগ্রহ ও কৌতুহল অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক মনে করা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন।

অতীতে নবী ও নবুওতের স্বরূপ ও মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা এরূপ ধারণার শিকার হয়েছিল। আর এখন এর বিস্তার দেখা যায় ঐ সকল লোকের মাঝে, যারা সুন্নাহর মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ এবং হাদীসের মর্যাদা ও প্রামাণিকতার মুনকির। তেমনি যারা ধর্মের খ্রিস্টীয় ধারণায় প্রভাবিত এবং পশ্চিমা চিন্তা ও দর্শনে আক্রান্ত।

বাস্তবতা হচ্ছে, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম সমগ্র-মানবতার জন্য পূর্ণাঙ্গ আদর্শ, উন্নত অনুকরণীয় নমুনা। চিন্তা-চেতনা, স্বভাব-চরিত্র, গ্রহণ-বর্জন ও শত্রুতা-মিত্রতার চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গতম মাপকাঠি। তাঁরা হয়ে থাকেন ঐশী করুণার অবতরণস্থল, তাঁর অপার মহিমা ও দানের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁদের আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র ও জীবনের রীতি-নীতি আল্লাহর অতিপ্রিয় হয়ে থাকে। সকল জীবন-ধারার মাঝে তাঁদের জীবন-ধারা, সকলের স্বভাব-চরিত্রের মাঝে তাঁদের স্বভাব-চরিত্র এবং মানুষের বিচিত্র আদত-অভ্যাসের মাঝে তাঁদের অভ্যাস ও আদতই আল্লাহর পছন্দের। তাঁরা যে পথে চলেন তা আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায়। অন্য সকল পথ ও পন্থার উপর প্রাধান্য পেয়ে যায়। শুধু এই জন্য যে, নবীগণের মুবারক কদম এতে পড়েছে। তাঁদের প্রিয় সকল বিষয় ও নিদর্শন এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বস্তু ও কর্মের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি যুক্ত হয়ে যায়। এ কারণেই এগুলো গ্রহণ করা এবং নিজের মাঝে তাঁদের আখলাকের একটুখানি ঝলক সৃষ্টি করতে পারাও আল্লাহর মহব্বত ও সন্তুষ্টি লাভের নিকটতম ও সহজতম উপায়। কে না জানে, বন্ধুর বন্ধুও বন্ধু আর শত্রুর বন্ধুও শত্রু।

খাতামুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানীতে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ-খাতা মাফ করে দিবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। –সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩১

পক্ষান্তরে জালিম অনাচারী ও কুফরীর পথ গ্রহণকারীদের প্রতি আকর্ষণ, তাদের জীবন যাপনের ধারা ও পদ্ধতিকে প্রাধান্য দান, তাদের সাথে অন্তর-বাহিরের সাদৃশ্য স্থাপন হচ্ছে এমন বিষয়, যা আল্লাহর ক্রোধ সঞ্চারকারী ও বান্দাকে আল্লাহ থেকে বিদূরিতকারী। ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ.

তোমরা ঝুঁকবে না ওদের প্রতি যারা জুলুম ও সীমালঙ্ঘন করেছে। যদি তা কর তবে তোমাদের স্পর্শ করবে জাহান্নামের আগুন। তোমাদের তো আল্লাহ ছাড়া কোনো বন্ধু নেই। অতপর তোমরা আর সাহায্য পাবে না। –সূরা হূদ (১১) : ১১৩

আম্বিয়ায়ে কেরামের এই রীতি-নীতি ও আদত-অভ্যাস শরীয়তের পরিভাষায় 'খিসালে ফিতরাত' ও 'সুনানুল হুদা' নামে অভিহিত। ইসলাম এগুলোর প্রতি উৎসাহিত করে।

জীবন ও কর্মে এই আদত-অভ্যাস, রীতি-নীতি গ্রহণের দ্বারা মানুষ নবীগণের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে, যে রঙ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ–

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ

(বল, আমরা গ্রহণ করেছি) আল্লাহর রঙ, আর কার রঙ হবে আল্লাহর রঙের চেয়ে ভালো। আমরা তো তাঁরই বন্দেগী করি। –সূরা বাকারা (২) : ১৩৮

ইসলামে এক রীতির উপর অন্য রীতির এবং এক জীবনধারার উপর অন্য জীবনধারার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের তাৎপর্য এখানেই নিহিত। একারণেই ইসলামী শরীয়তে আম্বিয়ায়ে কেরামের রীতি-নীতিকে ঈমানদারের নিদর্শন ও স্বাভাবিকতার দাবি বলে অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে এর বিপরীত পথ ও পদ্ধতি চিহ্নিত হয় স্বাভাবিকতা-বিরুদ্ধ ও আহলে জাহিলিয়াতের নিদর্শন বলে। এই দুই পথের মাঝে পার্থক্য শুধু এই যে, একটি আল্লাহর নবী ও প্রিয় বান্দাদের গৃহীত পথ আর অপরটি এমন সব লোকের, যারা হেদায়েতের আলো ও আসমানী শিক্ষার রাহনুমায়ী থেকে বঞ্চিত।

এই মৌলনীতি থেকেই বের হয়ে আসে পানাহারে ও অন্যান্য কাজে ডানহাত-বামহাত ব্যবহারের পার্থক্য এবং পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশভূষা ও জীবনযাত্রার নানা ক্ষেত্রের বহু নীতি ও আদব, যা সুন্নতে নববী ও ফিকহে ইসলামীর এক বিরাট অধ্যায়।[১]

তো দ্বীনের এই যে বৈশিষ্ট্য, নবী ও উম্মতের এই যে সম্পর্ক এ তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলায় আরো বেশি গুরুত্বের দাবিদার। তাঁর সঙ্গে নিছক বিধিগত সম্পর্ক নয়, হতে হবে আত্মা ও আবেগের সম্পর্ক, গভীর ও স্থায়ী মুহাব্বতের সম্পর্ক, যা জান-মাল পরিবার-পরিজনের ভালবাসার চেয়েও বেশি হবে। সহীহ হাদীসে আছে–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ، وَوَلَدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হই। –মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১২৮১৪

এক্ষেত্রে ঐ সকল পথ ও পন্থা, কারণ ও কার্যকারণ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, যা এই ভালবাসার ধারাকে ক্ষীণ করে দেয়, ভালবাসার আবেগ-অনুভূতিকে

১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, লেখকের গ্রন্থ 'মানসাবে নবুওয়াত আওর উসকে আলী মাকাম হামিলীন' পৃ. ১১৮-১২০

নিস্তেজ করে দেয় এবং ইত্তিবায়ে সুন্নাতের জযবা ও প্রেরণাকে কমযোর করে দেয়। তাঁকে সকল পথের সুবিজ্ঞ, সর্বশেষ রাসূল ও সর্বজনের অভিভাবক বলে মেনে নিতে দ্বিধান্বিত করে আর হাদীস ও সীরাত-গ্রন্থসমূহের প্রতি বিমুখ ও অনাগ্রহী করে তোলে।

কুরআনে কারীমের সূরা আহযাব, সূরা হুজুরাত, সূরা ফাত্‌হ ইত্যাদি গভীরভাবে পাঠ করলে, তাশাহহুদ ও সলাতুল জানাযায় দরূদ ও সালাতের উপস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে, এবং কুরআন মাজীদে দরূদ পাঠের যে আদেশ-উৎসাহ, হাদীস শরীফে দরূদের যে ফযীলত-মাহাত্ম্য– এই সকল কিছুর তাৎপর্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে একজন মুমিনের কাছে নিছক বিধিগত সম্পর্কের চেয়ে বেশি কিছু কাম্য। আইনী সম্পর্কের দাবি তো বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমেই পূরণ হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে কাম্য ঐ আদব-লেহাজ, ঐ ভক্তি-ভালবাসা, ঐ কৃতজ্ঞতা-কৃতার্থতার আপ্লুত প্রেরণা, যা হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হয়ে দেহের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হতে থাকবে। ভক্তি-ভালবাসার এই যুগপৎ অবস্থাকে আলকুরআনে তা'যীর ও তাওকীর শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ

তোমরা তাঁর নুসরত করবে এবং তাকে শ্রদ্ধা করবে। –সূরা ফাত্‌হ (৪৮) : ৯

এই গভীর ভক্তি-ভালবাসার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, গযওয়ায়ে রজী'তে হযরত খুবাইব ইবনে আদী রা. ও যায়েদ ইবনুদ দাছিনার ঘটনা, উহুদ যুদ্ধের পর বনু দীনারের এক মুসলিম নারীর কথোপকথন এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সেই অতুলনীয় ইশক ও মহব্বত, আদব-ইহতিরাম, যা লক্ষ করে আবু সুফিয়ান (যিনি ঐ সময় পর্যন্ত ইসলাম কবুল করেননি) বলে উঠেছিলেন, আমি কারো প্রতি কারো এইরকম ভক্তি-ভালবাসা দেখিনি, যে রকম মুহাম্মাদের প্রতি তাঁর সঙ্গীদের দেখেছি।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে কুরাইশের দূত উরওয়া ইবনে মাসউদ বলেছিল, কসম আল্লাহর! আমি কিসরা ও কায়সারের দরবারেও গিয়েছি, কিন্তু মুহাম্মাদের সাথীদের যেভাবে তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে দেখেছি, কোনো বাদশাহকেও তেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে কাউকে দেখিনি।[২]

এই ইশকে রাসূলেরই বড় হিস্যা পেয়েছিলেন উম্মাহর ঐ সকল বিজ্ঞ উলামা, মুসলিহ ও মুজাদ্দিদ, রাহনুমা ও রাহবারগণ, যাঁরা দ্বীনের প্রকৃত চেতনা ও প্রাণসত্তাকে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। তাকদীর যাদের নির্বাচন করেছিল মিল্লাতের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের কীর্তি সম্পাদনের জন্য।

শরীয়তের সীমা ও বিধানের অনুগত থেকে, সাহাবায়ে কেরামের উসওয়া ও আদর্শ অনুসারে এই পবিত্র রাসূলপ্রেমই হচ্ছে ঐ উপাদান, যা ছাড়া নবী-আদর্শের পূর্ণ অনুসরণ, শরীয়তের পথে পূর্ণ অবিচলতা, নফসের ন্যায়নিষ্ঠ মুহাসাবা ও সুখে দুঃখে, ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যথাযথ ইত্তিবা সম্ভব নয়। এই মহব্বতই বহু মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধির উপশম এবং স্বভাব-চরিত্রের শুদ্ধি ও ইসলাহ-তাযকিয়ার কার্যকর উপায়। ভালবাসার জোয়ারই ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে সকল ময়লা-আবর্জনা। আর তা দেহের শিরা-উপশিরায় এমনভাবে ছড়িয়ে যায় যেমন উষার সমীরণ জাগিয়ে তোলে পুষ্প-বৃক্ষের স্নিগ্ধতা। আল্লাহ ও রাসূলের প্রেমে যেই মুসলিম জাতি একদিন ছিল লকলকে অগ্নিশিখার মতো এরই অভাবে আজ তারা পরিণত হয়েছে শীতল ছাই গাদায়।

---

২. বিস্তারিত ঘটনা সীরাতের কিতাবে দেখুন। সংক্ষেপে : হযরত যায়েদ ইবনুদ দাছিনা রা.-কে কাফিররা হত্যার উদ্দেশ্যে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন আবু সুফিয়ান তাঁকে বলল, তুমি কি পছন্দ করবে, তুমি তোমার ঘরে নিরাপদে থাক আর এখানে তোমার স্থলে মুহাম্মাদকে নিয়ে আসা হোক? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! আমি তো এটুকুও সহ্য করব না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে আছেন সেখানেও একটি কাঁটা তাঁর গায়ে ফুটুক আর আমি ঘরে আরামে বসে থাকি!
বনু দীনারের এক সাহাবিয়ার স্বামী, বাবা ও ভাই প্রত্যেকে উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তাকে এই সংবাদ দেয়া হলে তিনি অস্থিরকণ্ঠে বলে উঠলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন। সাহাবীরা বললেন, আলহামদু লিল্লাহ, তিনি ভালো আছেন। সাহাবিয়া বললেন, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল। তাকে নিয়ে যাওয়া হল, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখামাত্র তিনি বলে উঠলেন, আপনি যখন বেঁচে আছেন তখন আমার সকল মুসীবত তুচ্ছ।
উহুদ যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর কাফিরদের তীব্র আক্রমনের মুখে হযরত আবু দুজানা রা. নিজের দেহকে ঢাল বানিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আবু তালহা রা. নিজের হাত দিয়ে কাফিরদের তীর তরবারির আঘাত ঠেকিয়ে দিচ্ছিলেন। ফলে সারা জীবনের জন্য তার হাতটি অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

প্রেমের আগুন নিভে গেছে তাই আধাঁর
মুসলিম তো নয় এরা মাটির পাহাড়।

* * *

সাত. এই দ্বীনের আরেক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পূর্ণাঙ্গতা ও চিরন্তনতা। খোদায়ী এলান হয়ে গেছে যে, আকীদা ও শরীয়ত তথা যা কিছুর উপর দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি নির্ভরশীল তা পূর্ণাঙ্গরূপে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا.

মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; তিনি তো আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। –সূরা আহযাব (৩৩) : ৪০

কুরআন কারীম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন, দ্বীন তার পূর্ণাঙ্গতা চিরন্তনতা ও মানবতার চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের চূড়ান্ত মানযিলে পৌঁছে গেছে।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।[৩]

গভীরভাবে চিন্তা করলে স্পষ্ট হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে নবুওতের সমাপ্তির মাঝে নিহিত আছে মানবতার মর্যাদা এবং আল্লাহর বিশেষ দয়া ও করুণা। এটি এই ঘোষণার ইঙ্গিতবাহী যে, মানবজাতি এখন পরিণত ও পরিপক্ক বয়সে উপনীত হয়েছে। বহুকাল যাবৎ সে যে সীমাবদ্ধ

---

৩. এই আয়াত দশম হিজরীতে বিদায় হজ্বের আরাফার দিন নাযিল হয়। অতীত ধর্মসমূহের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন জনৈক ইহুদী পণ্ডিত উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন– এ এক অনন্য মর্যাদা, যা শুধু মুসলিমেরাই লাভ করল। এ শুধু ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য, অন্য কোনো ধর্ম-মিল্লাতের এতে কোনো হিস্যা নেই। সেই ইহুদী পণ্ডিত হযরত ওমর রা.-কে বলেছিলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবে এমন একটি আয়াত আছে তা যদি আমাদের উপর নাযিল হত তাহলে ঐ দিনটিকে আমরা জাতীয় উৎসব-দিবসে পরিণত করতাম।
হযরত ওমর রা. জবাবে বলেছিলেন, এই আয়াত কবে, কোথায় নাযিল হয়েছিল, সে সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় অবস্থান করছিলেন আমি তা খুব ভালো করে জানি। সেই দিনটি ছিল আরাফার দিন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর) অর্থাৎ আমাদের নতুন কোনো উৎসব উদ্ভাবনের প্রয়োজন নেই। ঐ দিনটিই ছিল আমাদের এক ঈদের দিন। আর অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলাম কোনো উৎসবপ্রিয় ধর্ম নয়।

গণ্ডিতে বিকশিত হচ্ছিল এখন তা থেকে বেরিয়ে এসেছে। এখন সে প্রবেশ করতে যাচ্ছে পরস্পর পরিচিত, বিশ্ব-ঐক্য, জ্ঞান, সভ্যতা ও বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের এক উন্মুক্ত দিগন্তে। সম্ভাবনা জেগেছে সকল প্রাকৃতিক বাধা ও ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করার এবং স্ব স্ব অঞ্চলে আবদ্ধতার প্রবণতা থেকে মুক্ত হওয়ার। গোষ্ঠীবদ্ধতা ও স্বাদেশিকতার স্থলে সে এখন পরিচিত হচ্ছে বিশ্বজগৎ ও বিশ্বমানবতার ধারণার সাথে। পরিচালিত হচ্ছে বিশ্বজনীন হিদায়াত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্মিলিত প্রয়াসের পথে। সে প্রস্তুত হচ্ছে প্রকৃতির শক্তি, বিশ্বাসী মস্তিষ্ক, সুস্থ হৃদয় ও সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে কাজে লাগানোর জন্য।

অতীতে নবুওতের ধারা চলমান থাকায় সত্য-মিথ্যা উভয়ের সম্ভাবনা, মিথ্যা নবুওত দাবি, আসমানী শিক্ষা ও দাওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের প্রাদুর্ভাব, ঐসকল মিথ্যা দাবির প্রতি আহ্বান এবং সেসবের ভিত্তিতে মুমিন-কাফির নির্ধারণের প্রবণতা হেতু অতীত উম্মতসমূহকে বিরাট বিপদের মুখোমুখী থাকতে হয়েছে।

তৎকালীন ইহুদী ও খ্রিস্টান-সমাজে মিথ্যা নবুওত দাবি একপ্রকার শখের বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। তা ছিল সে সময়ের বড় মাথাব্যথার কারণ। মানুষের মেধা, ধর্মীয় কাজের শক্তি ও যোগ্যতা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় ও কল্যাণের কাজে ব্যবহৃত না হয়ে এই সমস্যার পেছনেই খরচ হয়ে যাচ্ছিল এবং এটিও ইহুদী ও খ্রিস্টীয় সমাজে দ্বন্দ্ব-কলহ, অস্থিরতা-অরাজকতা এবং সন্দেহ-সংশয়ের দুয়ার খুলে দিয়েছিল।

কিছুদিন পর পরই একেক মহল্লায় নতুন নবুওতের দাবি ও দাওয়াতের অভ্যুদয়ের কারণে ধর্মীয় সমাজ সমকালীন সকল সমস্যা থেকে চোখ ফিরিয়ে এই আহ্বানের স্বরূপ নির্ণয়ে এবং এই 'নবীর' সত্য-মিথ্যার বিচার-বিশ্লেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। নবুওত-ধারার সমাপ্তি ঘোষণার মাধ্যমে এই বিপদের অবসান ঘটল রোজ রোজকার এই বিপদ ও পরীক্ষা থেকে সীমাবদ্ধ মানবীয় শক্তি ও সক্ষমতা নাজাত পেয়ে গেল। এখন নতুন ওহী ও নতুন নির্দেশনার প্রতীক্ষায় থাকার স্থলে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নির্দেশনার ভিত্তিতে আল্লাহপ্রদত্ত মেধা ও শক্তিকে বিশ্ব ও বিশ্বমানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করার দাওয়াত দেওয়া হল। আর এভাবেই দ্বন্দ্ব-সংশয় ও সামাজিক অনৈক্যের ঐ মহা বিপদ থেকে মানুষের চিরমুক্তি ঘটল।[৪]

খতমে নবুওতের আকীদার মাধ্যমেই এই উম্মত ভয়াবহ সব ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করেছে এবং ধর্ম ও আকীদার ঐক্য রক্ষার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছে।

এই উম্মতের আছে এক আধ্যাত্মিক কেন্দ্র, আছে বিশ্বজনীন জ্ঞান ও সংস্কৃতির উৎস। আছে এক স্পষ্ট ও সুদৃঢ় স্বকীয়তা, যার সঙ্গে তার সম্বন্ধ অতি গভীর ও শক্তিশালী। এরই ভিত্তিতে যুগ-যুগান্তরে দেশ-দেশান্তরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে মুসলিমের একতা। এ থেকেই সৃষ্টি হতে পারে শক্তিশালী দায়িত্ববোধ. অন্যায়-অসত্যের প্রতিরোধে, ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠায়, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে এবং দ্বীনে খালিসের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যাকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই উম্মতের এখন না কোনো নতুন নবীর প্রয়োজন আছে, না কোনো 'মাসুম' নিষ্পাপ ইমামের, যিনি নবীদের সেই কাজ সমাধা করতে আসবেন যা তাঁরা –আল্লাহ মাফ করুন– সম্পন্ন করে যেতে পারেননি।[৫]

ইসলামের পুনর্জাগরণ ও নতুন ধর্মীয় আন্দোলনের জন্য এমন কোনো রহস্যময় ব্যক্তি বা আহ্বানেরও প্রয়োজন নেই, যা বোধ-বুদ্ধির ঊর্ধ্বের ও স্বাভাবিকতার পরিপন্থী, যাকে ভাগ্যান্বেষী শ্রেণি তাদের হীন স্বার্থে ব্যবহারের ও রাজনৈতিক স্বার্থ-হাসিলের হাতিয়ার বানাবার সুযোগ পায়। মানবতার উপর এ আল্লাহর এক মহা অনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ লোকই শুকরিয়া আদায় করে না।

* * *

আট. এই দ্বীনের আরেক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আপন স্বরূপ ও সজীবতাসহ এর উপস্থিতি। এই দ্বীনের কিতাব আলকুরআন সুসংরক্ষিত ও সর্বযুগে অনুধাবনযোগ্য। এই কিতাবের বাহক উম্মাহ ঐ ব্যাপক অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা থেকে, ঐ সর্বগ্রাসী বিচ্যুতি ও ব্যাপক ষড়যন্ত্রে প্রতারিত হওয়া থেকে নিরাপদ থেকেছে অতীতের বহু জাতি তাদের ইতিহাসের কোনো পর্বে যার শিকার হয়েছিল, বিশেষত খ্রিস্টান জাতি তো একেবারে শুরুতেই এই অবস্থার শিকার হয়ে গিয়েছিল।

কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ ও মুজিযা হওয়ার এক প্রমাণ হচ্ছে, এই কিতাবের সর্বাধিক পঠিত সূরা–সূরাতুল ফাতিহায় খ্রিস্টানদের চিহ্নিত করা হয়েছে الضالين 'পথভ্রষ্ট' বলে (অথচ ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে (المغضوب عليهم)। এই 'পথভ্রষ্ট' শব্দের তাৎপর্য, খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের এই বিশেষণে অভিহিত করার যথার্থতা তিনিই উপলব্ধি করতে পারবেন, যিনি খ্রিস্টবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে গভীরভাবে ওয়াকিফহাল।

খ্রিস্টধর্ম তার যাত্রার একেবারে শুরুতেই, যাকে বলা যায় 'ধর্মের শৈশব'– সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, যে পথের উপর হযরত ঈসা আ. একে রেখে গিয়েছিলেন। শুধু বিচ্যুত হওয়াই নয়; বরং এক ভিন্ন পথে এই ধর্ম-কাফেলা চলতে আরম্ভ করে। ফলে যতই তারা চলতে থাকল ততই সঠিক পথ থেকে দূরে বহু দূরে সরে যেতে থাকল। এ প্রসঙ্গে শুধু একটি সাক্ষ্যই যথেষ্ট মনে করছি। এক খ্রিস্টান পণ্ডিত Ernest De Bunsen তার Islam or true Christianity গ্রন্থে লেখেন, যে আকীদা ও ধর্ম-ব্যবস্থার উল্লেখ আমরা বর্তমান ইঞ্জিলে পাই, হযরত মসীহ তাঁর কথা ও কাজে এই ধর্ম-ব্যবস্থার দাওয়াত কখনো দেননি। বর্তমানে ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মাঝে যে বিভেদ এর দায়-দায়িত্ব হযরত মাসীহের উপর বর্তায় না, এ হচ্ছে সেই ইহুদী সন্তান বেদ্বীন পলের কীর্তি এবং পবিত্র গ্রন্থসমূহকে রূপক ও দেহাশ্রয়ী ব্যাখ্যায়, ভবিষ্যদ্বাণী ও উদাহরণে আকীর্ণ করে দেওয়ার পরিণাম। এসেনিয় (essenio) ধর্মমতের আহ্বায়ক স্টিফেনের অনুকরণে পল হযরত মাসীহ আ.-এর সাথে বৌদ্ধ ধর্মের বহু আচার সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছে। বর্তমান ইঞ্জিলে যেসব পরস্পর বিরোধী কথা ও কাহিনী দেখা যায়, যা হযরত মাসীহ আ.-কে তার প্রকৃত অবস্থান থেকে অনেক হীন করে উপস্থাপন করে, তার সবই এই পলের রচনা। হযরত মাসীহ নন, পল ও তার পরবর্তী পাদ্রী-সন্ন্যাসীরাই এই গোটা আকীদা-ব্যবস্থা প্রস্তুত করেছে, যাকে আঠারো শতক থেকে অর্থোডকস খ্রিস্টানজগৎ নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের বুনিয়াদ বানিয়ে রেখেছে।[৬]

পক্ষান্তরে ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

নিশ্চয়ই আমিই এই যিকর (আলকুরআন) নাযিল করেছি। আর আমিই এর হেফাযতকারী। –সূরা হিজ্র (১৫) : ৯

কুরআনের হেফাযত ও সংরক্ষণের এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা এবং অনুগ্রহ বর্ণনার রূপে

৪. চিন্তাভাবনার এই বিশৃঙ্খলা ও সমস্যার ভয়াবহতা বুঝতে হলে দেখুন : Encyclopedia of Religion and Ethics Edwin knox Michele -এর প্রবন্ধ ৮ : ৫৮৮

৫. অনেক ইছনা আশারী শীয়ার আকীদা এইরূপ।

৬. Islam or true Christianity p. 128

এই প্রতিশ্রুতির দাবি কী? স্বভাবতই এই ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতিতে কুরআনের অর্থ-মর্ম, ভাব-ব্যাখ্যা, এর শিক্ষা ও বিধানের অনুসরণ, জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও বাস্তবায়নও শামিল। ঐ গ্রন্থের কী মূল্য বা ঐ সংরক্ষণেরই বা কী অর্থ, যে গ্রন্থের অর্থ-মর্ম যুগ যুগ ধরে ধাঁধার মতো দুর্বোধ্য হয়ে থাকে এবং যা বাস্তব জীবনে বর্জিত ও পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকে? খোদ 'হিফয' শব্দটি যা উপরের আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে আরবী ভাষায় অতি গভীর ও বিস্তৃত মর্ম ধারণ করে।

তাছাড়া শুধু এইটুকুই বলা হয়নি, এরই সাথে ঘোষণা দেয়া হয়েছে–

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

একে (কুরআনকে) একত্র করা এবং পড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। আমি যখন তা পড়ব তখন তুমি শুনবে। পরে সেভাবেই পড়বে। অতপর এর ব্যাখ্যাও আমার দায়িত্বে। –সূরা কিয়ামাহ (৭৫) : ১৭-১৯

তেমনি ঐ ধর্মও আস্থাযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য হতে পারে না, যার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে দীর্ঘ অন্ধকার বিরতির মাঝে মাঝে কিছুকালের জন্য। যে বৃক্ষ দীর্ঘকাল অনুকূল আবহাওয়া পেয়েও ফল দিতে পারে না তা কি আস্থা ও যত্নের দাবি করতে পারে? তার সম্পর্কে কি প্রযোজ্য হতে পারে এই উদাহরণ–

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا.

(এই বৃক্ষ) সর্বদা ফল দেয় তার রবের আদেশে। –সূরা ইবরাহীম (১৪) : ২৫

তদ্রূপ এই উম্মত তো নিছক 'উম্মতে দাওয়াত' বা আসমানী কিতাব ও পয়গামের শুধু সম্বোধিত শ্রোতামাত্র নয়; বরং তারাই এই দ্বীনের ধারক-বাহক, বিশ্বজুড়ে এর প্রচার-প্রসার; এর সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, নিজের জীবনে এর বাস্তবায়ন এবং অন্যদেরকে এর প্রতি আহ্বানের যিম্মাদার। কাজেই এই কিতাব সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও উপলব্ধি হতে হবে ঐ জাতির জ্ঞান ও উপলব্ধি থেকে অনেক গভীর ও উৎকৃষ্ট, যাদের বৈশিষ্ট্য শুধু এইটুকু যে, ওদের ভাষায় কিতাব নাযিল হয়েছিল।

***

নয়. শেষ কথা হচ্ছে, ইসলাম চায় এক অনুকূল পরিবেশ। আরো স্পষ্ট ও সতর্ক ভাষায় বললে, ইসলামের প্রয়োজন এক উপযুক্ত মওসুম ও নির্দিষ্ট মাত্রার শীতোষ্ণতা। কারণ, এই ধর্মাদর্শ এক জীবন্ত জীবনাদর্শ। এ নিছক বুদ্ধিজাত তত্ত্ব-দর্শন নয়, যার অবস্থান মস্তিষ্কের কোনো নিভৃত কোষে কিংবা গ্রন্থাগারের কোনো নীরব কোণে। এ তো একইসাথে বিশ্বাস ও কর্ম, স্বভাব-চরিত্র, আবেগ-অনুভূতি জীবনবোধ ও জীবনদর্শনের নাম। মানুষকে সে ঢেলে নিতে চায় এক নতুন ছাঁচে, জীবনকে সে রাঙিয়ে তুলতে চায় এক নতুন রঙে। তাই দেখি, আল্লাহ তাআলা ইসলামকে উল্লেখ করেছেন সিবগাতুল্লাহ (صبغة الله) বিশেষণে। 'সিবগা' একটি রঙ, একটি বিশিষ্টতা।

অন্যান্য ধর্মাদর্শের তুলনায় ইসলাম অনেক বেশি সংবেদনশীল। এর আছে সুনির্ধারিত সীমারেখা, যা অতিক্রম করার অধিকার কোনো মুসলিমের নেই। অন্য কোনো ধর্মে ইরতিদাদ বা ধর্মত্যাগের এত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন মর্ম ও বিধান নেই, যা ইসলামে আছে। তেমনি ধর্মত্যাগের হীনতা ও ঘৃণ্যতার বিবরণও কোথাও এমনভাবে নেই, যেমনভাবে ইসলামে রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী, তাঁর শিক্ষা ও নির্দেশনা, তাঁর অনুপম আদর্শ ও সুন্নাহ (আকীদা-ইবাদত থেকে শুরু করে চরিত্র, নৈতিকতা, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, এমনকি আবেগ-অনুভূতি পর্যন্ত) সকল ক্ষেত্রে দ্বীনের জন্য ঐ পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে দ্বীন-ইসলামের অংকুরিত চারাটি সতেজ ও পল্লবিত হয়ে ওঠে। কারণ এই দ্বীন জীবনের সকল বৈশিষ্ট্য– অনুরাগ-বিরাগ, প্রফুল্লতা-প্রাণবন্ততা, গর্ব ও গৌরব ইত্যাদির সমষ্টি। ফলে তা রাসূলের আবেগ-অনুভূতি ও তাঁর জীবনের বাস্তব ঘটনাবলী ছাড়া যিন্দা থাকতে পারে না। আর এরই উৎকৃষ্ট সংকলন হচ্ছে সহীহ হাদীস ও সুন্নাহ। এই হাদীস ও সুন্নাহর মাঝেই ঐ আদর্শ ও অনুসরণীয় সমাজের কাঠামো সংরক্ষিত হয়েছে, যা ছাড়া দ্বীন-ইসলাম যথার্থরূপে থাকতে পারে না।

একারণে আল্লাহ তাআলা কুরআনের হেফাজতের পাশাপাশি কুরআনের বাহক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতও সংরক্ষণ করেছেন। এরই বদৌলতে সেই পবিত্র জীবনের ফয়েয-বরকত, এর সঞ্জিবনী ধারাও নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান রয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে যুগে যুগে উম্মাহর আলিমগণ মারূফ-মুনকার, সুন্নত-বিদআত এবং ইসলাম ও জাহিলিয়্যাহ্র মাঝে পার্থক্য নিরূপণের যোগ্য হয়েছেন। এরই মাধ্যমে ঐ মাপকাঠি তাদের হাতে এসেছে, যার মাধ্যমে তারা স্ব স্ব যুগের মুসলিম সমাজের প্রকৃত ইসলামী আকীদা ও আমল থেকে সরে যাওয়ার মাত্রা পরিমাপ করে থাকেন। এরই বরকতে তারা এই উম্মতের দ্বীনী মুহাসাবা, খাঁটি ও প্রকৃত দ্বীনের প্রতি আহ্বানের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছেন।

হাদীস ও সুন্নাহর এই বিরাট সংকলন [যার মধ্যে সিহাহসিত্তা (কুতুবে সিত্তাহ) সমধিক প্রসিদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত] এর পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার নিমগ্নতাই যুগে যুগে ইসলাহ ও তাজদীদের এবং উম্মাহর মাঝে বিশুদ্ধ ইসলামী চেতনা ও কর্ম রক্ষার অন্যতম প্রধান উৎস থেকেছে। এরই সাহায্যে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে সমাজ-সংস্কারের কর্মী ও সৈনিকেরা শিরক-বিদআত ও জাহেলী রসম-রেওয়াজকে নির্মূল করার এবং সুন্নতের প্রচার-প্রসারের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছেন। এই ভাণ্ডারই উম্মাহর উলামা ও সচেতন শ্রেণিকে অন্যায়-অনাচারের ও বিদআত-গোমরাহীর অসংখ্য শক্তি ও আন্দোলনের সাথে পাঞ্জা লড়ার এবং এদের মোকাবিলায় মাথায় কাফন বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা যুগিয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষী, এই উম্মাহর সংস্কার ও সংশোধন-প্রচেষ্টার ইতিহাস জড়িয়ে আছে ইলমে হাদীসের চর্চা ও অনুশীলন এবং সুন্নাহর প্রতি ভালবাসা ও পৃষ্ঠপোষকতার সাথেই। মুসলিম মনীষীদের মাঝে যখনই হাদীস ও সুন্নাহর চর্চা ও অবগতিতে ভাটা পড়েছে এবং এর স্থলে অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বেড়েছে তখনই মুসলিমসমাজ সৎ ও বিজ্ঞজনদের উপস্থিতি সত্ত্বেও নতুন নতুন বিদআত, জাহেলী রীতি-নীতি এবং অপরাপর ধর্ম ও মতবাদের আগ্রাসনের শিকার হয়েছে। এমনকি কখনো কখনো এমন আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে যে, না জানি এই সমাজও জাহেলী সমাজেরই দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত হয়ে যায়।

***

এই হচ্ছে আমাদের দ্বীনের বিশেষ চেতনা ও বৈশিষ্ট্য, কাঠামো ও রূপরেখা, যা এই দ্বীনের স্বরূপ ও স্বকীয়তা নির্দেশ করে এবং অপরাপর দর্শন ও ধর্মাদর্শ থেকে এর স্বাতন্ত্র্য বিধান করে। মুসলিমমাত্রেরই করণীয়– এই সকল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত ও সচেতন হওয়া এবং এক্ষেত্রে প্রচণ্ড গৌরববোধ পোষণ করা।

এরই মাধ্যমে আমরা আপন যুগে হক-বাতিলের সংঘাত ও সংমিশ্রণের কালেও (যা কখনো সংঘাতের চেয়েও ভয়াবহ ও ক্ষতিকর হয়ে থাকে) সঠিক দ্বীনের উপর অবিচল থাকতে পারব এবং এর খিদমত ও হিফাযতের সৌভাগ্য লাভেও ধন্য হতে পারব।

وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

আল্লাহ যাকে চান সীরাতে মুসতাকীমের পথনির্দেশ দান করেন। –সূরা বাকারা (২) : ২১৩ ●

[অনুবাদে : মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ]

একটি অলীক কাহিনী

মূসা আলাইহিস সালাম ও এক পাপিষ্ঠা নারীর কাহিনী

একদিন এক পাপিষ্ঠা নারী মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসে বলল, আমি এক জঘন্য পাপ করে ফেলেছি। দয়া করে আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন তিনি আমাকে ক্ষমা করে দেন।

মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, তুমি কী করেছ? নারীটি বলল, আমি যিনা করেছি এবং এর ফলে যে সন্তান জন্মেছিল তাকেও হত্যা করেছি।

মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, চলে যাও এখান থেকে হে পাপিষ্ঠা! তা না হলে তোমার পাপের কারণে আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে আমাদের সবাইকেও ধ্বংস করে দেবে।

নারীটি ভগ্ন হৃদয় নিয়ে চলে গেল। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে মূসা! কেন আপনি এই নারীটিকে ফিরিয়ে দিলেন? আপনি কি এর চেয়েও জঘন্য ও গুরুতর পাপী সম্পর্কে জানেন না? মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, এর চেয়ে গুরুতর পাপী আবার কে? জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত তরক করে।

এটি একটি অলীক কাহিনি, যা মূসা আলাইহিস সালামের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্রে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সালাত তরক করার আযাব সম্পর্কে কুরআনের কত আয়াত এবং কত সহীহ হাদীস রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপক চর্চা দরকার। আর যিনা ও সন্তান হত্যা– উভয়টি যে ভয়াবহ কবীরা গুনাহ তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

একে তো ঘটনাটি যে ভিত্তিহীন– তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়। তাছাড়া আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ– আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। –সূরা যুমার (৩৯) : ৫৩

তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন– এ তো নবীদেরই শিক্ষা। মূসা আলাইহিস সালাম কি তা জানতেন না? মানুষকে তওবার দিকে আহ্বান করাই তো নবীদের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল; সেখানে একজন নবী তওবাকারীকে ফিরিয়ে দিবেন? আল্লাহ আমাদের এজাতীয় কথা বলা ও বিশ্বাস করা থেকে হেফাজত করুন– আমীন।

নামায তরককারী কত ঘৃণিত– তা বুঝানোর জন্য এ জাল বর্ণনাটি পেশ করা হয়; অথচ 'তারিকুস সালাহ'–নামায তরককারীর বিষয়ে বহু সহীহ হাদীস রয়েছে। এখানে কয়েকটি পেশ করা হল :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

আমাদের মাঝে ও তাদের মাঝের নিরাপত্তা-অঙ্গিকারের নিদর্শন হচ্ছে, সালাত। যে সালাত তরক করল, সে কুফরি করল। (অর্থাৎ যে পর্যন্ত তারা সালাত আদায় করবে তাদের জানমাল ইত্যাদির নিরপত্তার ক্ষেত্রে তারা মুসলিমদের মত গণ্য হবে।) –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬২১

আবুদ দারদা রা. বলেন, আমার প্রিয় (নবীজী) আমাকে ওসিয়ত করেছেন–

...لَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.

(তন্মধ্যে একটি ছিল,) ইচ্ছাকৃত ফরজ সালাত তরক করো না। কারণ, যে ইচ্ছাকৃত ফরজ সালাত তরক করে তার থেকে আল্লাহর জিম্মা উঠে যায়। –সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪০৩৪; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৫২০০

এছাড়াও নামায তরক বিষয়ে আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। আমরা সেগুলোই বলব; কোনো জাল বর্ণনা বলব না। আল্লাহ আমাদের নামায তরক করা থেকে হেফাযত করুন। আমাদের নামাযকে সুন্দর করার তাওফীক দিন। হক আদায় করে সময় মত নামায আদায় করার তাওফীক দিন– আমীন।

একটি মনগড়া কথা

দুআর সময়ে প্রবাহিত চোখের পানি চেহারায় মুছে নিলে সেই চেহারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে না

কিছু কিছু মানুষকে বলতে শোনা যায়, দুআর সময় চোখ থেকে যে পানি ঝরে তা যদি কেউ রুমাল ইত্যাদি দিয়ে না মুছে চেহারায় ঘষে নেয় তাহলে ঐ চেহারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে না। এটি একটি মনগড়া কথা। তা না বলে যা একাধিক সহীহ হাদীসে এসেছে তা-ই বলা দরকার।

হাদীস শরীফে আল্লাহর ভয়ে ঝরা চোখের পানির ফযীলত এসেছে–

لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ...، قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ... (قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)

দুটি ফোঁটা আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয়; (তন্মধ্যে) একটি হল, আল্লাহ্র ভয়ে প্রবাহিত অশ্রুফোঁটা। –জামে তিরমিযী, হাদীস ১৬৬৯

আরেক হাদীসে এসেছে–

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ. (قال الترمذي: وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)

দুটি চোখকে (জাহান্নামের) আগুন স্পর্শ করবে না; এক. যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। দুই. যে চোখ রাত জেগে আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়। –জামে তিরমিযী, হাদীস ১৬৩৯

আর আল্লাহর ভয়ে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া– আল্লাহর কাছে এতই পছন্দনীয় যে, এর পুরস্কার স্বরূপ তিনি ঐ ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত– 'সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন; যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। (তন্মধ্যে একজন হল,) ঐ ব্যক্তি যে একাকী-নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে (আল্লাহর ভয়ে) তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৬০

তো বোঝা গেল, আল্লাহর ভয়ে প্রবাহিত অশ্রুফোঁটা আল্লাহ অনেক পছন্দ করেন এবং যে চোখ থেকে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু প্রবাহিত হবে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। প্রবাহিত পানি চেহারায় না মুছলে এই ফযীলত নষ্ট হয়ে যাবে না। আর মুছলে তার ফযীলত বেড়ে যাবে– এমন কোনো কথা প্রমাণিত নয়। ●

ফতোয়া বিভাগ : মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

তাহারাত-পবিত্রতা

জনৈকা শিক্ষিকা
উত্তরা, ঢাকা

৪৩৬০ প্রশ্ন : বর্তমানে ঔষধ সেবনের মাধ্যমে সাময়িকভাবে মাসিক স্রাব বন্ধ করে রাখা যায়। তাই অনেক মহিলা রমযান মাসের সবগুলো রোযা রাখার জন্য ঔষধ সেবনের মাধ্যমে স্রাব বন্ধ করে রাখে। বিশেষত হজ্ব চলাকালীন হায়েয আসলে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই অধিকাংশ মহিলা হজ্বের সময়গুলোতে ঔষধ সেবনের মাধ্যমে স্রাব বন্ধ করে রাখে, যেন হজ্বের আমলগুলো কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সম্পাদন করা যায়। এজন্য হুযুরের কাছে জানতে চাচ্ছি–

ক. ঔষধ সেবনের মাধ্যমে এভাবে ঋতুস্রাব বন্ধ করে রাখা কি জায়েয আছে?

খ. এ অবস্থায় কি সে নামায, রোযা ও তাওয়াফ ইত্যাদি আদায় করতে পারবে? যদি পারে তাহলে পরবর্তীতে এগুলো কাযা করা লাগবে কি না?

দয়া করে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ওষুধ সেবনের কারণে হলেও একজন মহিলা যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ তার মাসিক স্রাব চালু না হবে ততক্ষণ তাকে নামায-রোযা করে যেতে হবে এবং এ অবস্থায় সে তাওয়াফও করতে পারবে। আর সে যেহেতু পবিত্র অবস্থাতেই নামায-রোযা ইত্যাদি পালন করেছে তাই পরবর্তীতে তাকে এ সময়ের নামায-রোযার কাযা করতে হবে না। আর এজাতীয় ঔষধ ব্যবহার করতে নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু এটি কোনো উত্তম পন্থাও নয়। বিশেষ ওজর না থাকলে স্বাভাবিক নিয়মে চলাই উচিত।

আর এ ধরনের ঔষধ ব্যবহারের পূর্বে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এজাতীয় ঔষধ সেবনের কারণে কারও শারীরিক কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই পরবর্তী জটিলতা এড়ানোর জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। –মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ১২১৯, ১২২০; আলমুহীতুল বুরহানী ১/৩৯৯; জামিউ আহকামিন নিসা ১/১৯৮; ফিকহুন নাওয়াযিল ২/৩০৮

সালাত-নামায

ওমর ফারুক
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

৪৩৬১ প্রশ্ন : বর্তমানে অধিকাংশ ট্রেনেই নামায আদায়ের ব্যবস্থা থাকে। তবে ট্রেন চলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে নামায পড়া বেশ কষ্টকর। কারণ ঝাঁকুনির দরুণ পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তাছাড়া নামায পড়া অবস্থায় ট্রেন দিক পরিবর্তন করলে কেবলা ঠিক রাখা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় সফরকালে ট্রেনে নামায পড়ব কীভাবে? দয়া করে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ফরয নামায যথাসাধ্য দাঁড়িয়ে আদায় করা ফরয। তাই ট্রেনে সফরকালেও যথাসম্ভব দাঁড়িয়ে নামায পড়তে চেষ্টা করবে। দাঁড়িয়ে নামায পড়া বেশি কষ্টকর হলে কিংবা সম্ভবই না হলে বসে পড়ার অবকাশ আছে। আর নামাযে কেবলার দিক ঠিক রাখা ফরয। তাই ট্রেনে নামায শুরু করার পূর্বে কেবলার দিক সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তারপর নামায পড়বে। নামায পড়া অবস্থায় ট্রেন দিক পরিবর্তন করলে নামাযী তা বোঝা মাত্রই কেবলার দিকে ঘুরে যাবে। কেননা কেবলার দিক পরিবর্তনের কথা জানা সত্ত্বেও নামাযী যদি কেবলার দিকে না ঘুরে তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে শুরুতে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানোর পর যদি নামায পড়া অবস্থায় ট্রেন কেবলার দিক থেকে ঘুরে যায় এবং নামাযী তা জানতে না পারার কারণে সেভাবেই নামায পড়ে নেয় তাহলে নামায হয়ে যাবে। –মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, বর্ণনা ৪৫৫২; আলমুহীতুল বুরহানী ২/৪৩০; বাদায়েউস সানায়ে ১/২৯১; হালবাতুল মুজাল্লী ২/৪৫; রদ্দুল মুহতার ২/১০১; ইলাউস সুনান ৭/২১২

সালমান আবদুল্লাহ
নারায়ণগঞ্জ

৪৩৬২ প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের দেশের কোথাও কোথাও দেখা যায়, মসজিদে ঈদের নামায পড়া হয়। অথচ ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি যে, ঈদের নামায ঈদগাহেই পড়া হয়। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে মসজিদে ঈদের নামায পড়ার বিধান কী?

উত্তর : ঈদের নামায ঈদগাহে ও খোলা মাঠে পড়া সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীন সকলেই ঈদের নামায ঈদগাহে পড়তেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন–

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلّى.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন (ঈদের নামাযের জন্য) ঈদগাহে যেতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৫৬)

হযরত আলী রা. বলেন–

الْخُرُوجُ إِلَى الْجَبّانِ فِي الْعِيدَيْنِ مِنَ السّنّةِ.

দুই ঈদে (ঈদের নামাযের জন্য) খোলা মাঠে যাওয়া সুন্নত। (আলমুজামুল আওসাত, তাবারানী, হাদীস ৪০৪০)

তাই মাঠে পড়ার ব্যবস্থা থাকলে বিনা ওজরে মসজিদে ঈদের জামাত করা সুন্নতের খেলাফ হবে। তবে বিনা ওযরে মসজিদে ঈদের নামায আদায় করলেও তা আদায় হয়ে যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, বর্তমানে শহরে ঈদগাহ কম বিধায় অধিকাংশ মসজিদে ঈদের জামাত হয়। জায়গা সংকুলান না হওয়া বা বৃষ্টি ইত্যাদির কারণে মসজিদে ঈদের নামায পড়লে সুন্নতের খেলাফ হবে না। ওযরের সময় মসজিদে পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلّى بِهِمُ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ.

কোনো এক ঈদের দিন তাঁরা বৃষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে মসজিদে ঈদের জামাত আদায় করেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১১৫৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩১৩) –শরহুল মুনয়া পৃ. ৫৭১; আলবাহরুর রায়েক ২/১৫৯;

আদ্দুররুল মুখতার ২/১৬৯

আবদুল কাদির
ওয়েব থেকে প্রাপ্ত

৪৩৬৩ প্রশ্ন : রমযানে বিতিরের নামাযের প্রত্যেক রাকাতে জোরে কেরাত পড়তে হবে, না শুধু প্রথম দুই রাকাতে? ছোটদের জন্য লেখা একটি বইয়ে শুধু প্রথম দুই রাকাতে জোরে কেরাত পড়ার কথা বলা হয়েছে। এ বক্তব্যটি কি ঠিক? আশা করি দলীল-প্রমাণসহ বিস্তারিত জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

উত্তর : রমযানে বিতির নামায জামাতে পড়া সুন্নাত। আর বিতির নামায জামাতে পড়লে এর প্রত্যেক রাকাতেই জোরে কেরাত পড়া ওয়াজিব। এক্ষেত্রে শুধু প্রথম দুই রাকাতে জোরে কেরাত পড়ার কথা ঠিক নয়। -শরহুল মুনয়া পৃ. ২৯৬, ৪২০; হালবাতুল মুজাল্লী ২/৯৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৭২; রদ্দুল মুহতার ১/৪৬৯

তাওহিদুল ইসলাম
সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা

৪৩৬৪ প্রশ্ন : গত বছর রমযানে একদিন আমরা কয়েকজন হাফেয একসাথে তারাবীর নামায আদায় করি। প্রথম চার রাকাতে লম্বা কেরাত পড়ার কারণে অনেক রাত হয়ে যায়। এরপর বাকি ষোল রাকাত দুই সালামে আট রাকাত করে আদায় করে নেই। মুফতী সাহেবের নিকট জানার বিষয় হল, এক সালামে আট রাকাত আদায় করার দ্বারা আমাদের নামায কি আদায় হয়েছে?

উত্তর : আপনাদের উক্ত তারাবীর নামায আদায় হয়েছে। তবে একসাথে আট রাকাত পড়া ঠিক হয়নি। তারাবীর নামায দুই রাকাত করে পড়াই সুন্নত। তাই ভবিষ্যতে এমন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। -মারাকিল ফালাহ পৃ. ২২৫; আলমাবসূত, সারাখসী ২/১৪৭; আলবাহরুর রায়েক ২/৬৭; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৩২৯; হালবাতুল মুজাল্লী ২/৩৬৯; শরহুল মুনয়া পৃ. ৪০৫

উম্মে তাকী
ময়মনসিংহ

৪৩৬৫ প্রশ্ন : একদিন শেষ রাতে নফল নামায পড়ছিলাম। এ অবস্থায় আমার মাসিক শুরু হয়ে যায়। প্রশ্ন হল, উক্ত নফল নামায কি পবিত্র হওয়ার পর কাযা করতে হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত নফল নামায পবিত্র হওয়ার পর কাযা করতে হবে। কেননা, নফল নামায শুরু করার পর তা সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

তবে ফরয নামাযের মধ্যে যদি এমনটি হত অর্থাৎ ফরয নামায শুরু করার পর যদি মাসিক শুরু হত তাহলে পরবর্তীতে এর কাযা করা লাগত না। -আলমাবসূত, সারাখসী ২/১৪; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৩২; ফাতহুল কাদীর ১/১৫২; আলবাহরুর রায়েক ১/২০৫; রদ্দুল মুহতার ১/২৯১

আবু দাউদ
মাদারীপুর

৪৩৬৬ প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে যে হাফেযদ্বয় খতম তারাবিহ পড়ান তারা অধিকাংশ সময় কেবল আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেন। একবার জিজ্ঞাসা করা হলে তাদের একজন বললেন, খতম তারাবিতে দরূদ শরীফ ও দুআ মাছূরা না পড়ার অনুমতি আছে।

এ ব্যাপারে সঠিক মাসআলা জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর : তারাবির নামাযেও শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর দরূদ শরীফ ও দুআয়ে মাছূরা পড়া সুন্নত। তাই ওযর ছাড়া এ সুন্নত ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়। বিশেষ করে দরূদ শরীফ তো বেশি তাকিদপূর্ণ সুন্নত। তাই মুসল্লিদের কষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তা ছাড়া যাবে না। আর দুআয়ে মাছূরা লম্বা মনে হলে সংক্ষিপ্ত কোনো দুআ পড়া যায়। -আলমুহীতুল বুরহানী ২/২৫৩; বাদায়েউস সানায়ে ১/৬৪৫; মারাকিল ফালাহ পৃ. ২২৬; আলবাহরুর রায়েক ২/৬৯; হালবাতুল মুজাল্লী ২/১৮৪; শরহুল মুনয়া পৃ. ৪০৭

শিহাব সাকিব
হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ

৪৩৬৭ প্রশ্ন : একদিন বাড়িতে থাকা অবস্থায় যোহরের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার পরও নামায না পড়ে সফরে বের হয়ে যাই। পরে কোনো জটিলতার কারণে সফর অবস্থায়ও নামাযটি পড়া হয়নি। জানার বিষয় হল, মুকীম অবস্থায় ওয়াক্ত শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে এখন আমাকে কি চার রাকাতের কাযা করতে হবে, নাকি দুই রাকাতের কাযা করলেই চলবে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে যেহেতু ওয়াক্তের শেষের দিকে আপনি মুসাফির ছিলেন তাই দুই রাকাতের কাযা করবেন, পূর্ণ চার রাকাতের নয়। কেননা কোনো নামায কাযা হয়ে গেলে তা আদায়ের ক্ষেত্রে ওয়াক্তের শেষের অবস্থা ধর্তব্য হয়। ওয়াক্তের শেষে যদি সে মুকীম থাকে তাহলে মুকীমের নামায কাযা করতে হয়। আর মুসাফির থাকলে মুসাফিরের নামায। -খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২০২; তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/৫১৯; মাজমাউল আনহুর ১/২৪৩; বদায়েউস সানায়ে ১/২৬৬

আহমাদ জারিফ
ফরিদপুর

৪৩৬৮ প্রশ্ন : গত মাসে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সপরিবারে কলকাতা গিয়েছিলাম। যাওয়ার সময়ই পনের দিনের বেশি অবস্থানের ইচ্ছা ছিল। ভিসাও ছিল বিশ দিনের। কিন্তু আটদিনেই মোটামুটি কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় আর দুইদিন থেকে দেশে ফেরার ইচ্ছা করি। প্রথমে তো পনের দিন থাকব এই ভিত্তিতে মুকীম হিসেবে পূর্ণ নামাযই পড়েছি। কিন্তু আটদিন পর যখন স্পষ্ট হয়ে গেল, পনের দিন থাকা হচ্ছে না তখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যাই যে, এখন কসর করব নাকি আগের মতই পূর্ণ নামায পড়ব। পরে এ কথা ভেবে বাকি দু'দিনও পূর্ণ নামায পড়েছি যে, চার রাকাতের জায়গায় দুই রাকাত পড়লে তো নামাযই হবে না, তবে দুই রাকাতের জায়গায় চার রাকাত পড়লে অন্তত নামায হয়ে যাবে।

মুফতী সাহেবের কাছে আমার জিজ্ঞাসা হল, পরবর্তী দুই দিন কসর না করে পূর্ণ নামায পড়া কি ঠিক হয়েছে?

উত্তর : সফরে গিয়ে কোথাও পনের দিন অবস্থানের নিয়ত করলেই মুকীম হয়ে যায়। সুতরাং এরপর পনের দিনের আগেই নিজ এলাকায় ফেরার ইচ্ছা করলেও যতক্ষণ ঐ এলাকায় অবস্থান করবে সে মুকীমই থাকবে। তাই আপনিও পনের দিন পূর্ণ হওয়ার আগে দেশে ফেরার নিয়তের কারণে মুসাফির হয়ে যাননি, বরং মুকীমই ছিলেন। এ হিসেবে ঐ দুই দিন পূর্ণ নামায পড়া ঠিকই হয়েছে। তবে দ্বীনী কোনো বিষয়ে অনুমান করে নিজ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। বিজ্ঞ আলেমদের থেকে জেনে আমল করবে। -কিতাবুল আছল ১/২৩৫; আলমাবসূত, সারাখসী ১/২৩৯; আদ্দুররুল মুখতার ২/১৩১; ফাতাওয়া রহীমিয়া ৫/১৭৫

তাশরীফ
বরিশাল

৪৩৬৯ প্রশ্ন : আমি একদিন এক লোককে দেখলাম, নামায শেষ করে বের হওয়ার জন্য সে দরজার দিকে যাচ্ছে। কিছুদূর গিয়ে পুনরায় বসে পড়েছে। অতপর সিজদা ও বৈঠকের পর সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেছে। ব্যাপারটি তার কাছে

জানতে চাইলে সে বলল, আমার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব ছিল। আমি তা আদায় করতে ভুলে গিয়েছি। আর মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত যেহেতু ভুলে যাওয়া সাহু সিজদা আদায়ের সুযোগ থাকে তাই স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে আমি তা আদায় করে নিলাম। জানতে চাই, প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে সাহু সিজদা আদায় করার দ্বারা কি তার নামায ত্রুটিমুক্ত হবে? উল্লেখ্য, লোকটি নামায নষ্ট হওয়ার মত কোনো কাজ না করেই সিজদা করেছে।

উত্তর : লোকটির সাহু সিজদা আদায় হয়েছে। কেননা সাহু সিজদা ওয়াজিব হওয়ার পর কোনো ব্যক্তি যদি ভুলক্রমে সাহু সিজদা না করে সালাম ফিরিয়ে ফেলে এবং নামায নষ্ট হওয়ার মত কোনো কাজ না করে তাহলে মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত সাহু সিজদা করে নেওয়ার সুযোগ থাকে। এক্ষেত্রে কেবলার দিক থেকে সিনা ঘুরে গেলেও সাহু সিজদা সহীহ হয়ে যাওয়ার কথা ফকীহগণ বলেছেন। –বাদায়েউস সানায়ে ১/৪২০; ফাতহুল কাদীর ১/৪৫১; হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ. ২৫৭; রদ্দুল মুহতার ২/৯১

ফয়জুল্লাহ
কুমিল্লা

৪৩৭০ প্রশ্ন : কুরবানী ঈদে আমি তিন-চার দিনের জন্য চাঁদপুর থেকে ঢাকায় আসি। আমি জানতাম মুসাফিরের উপর তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব নয়। তাই আমি মুসাফির অবস্থায় বিভিন্ন সময় মুকীম ইমামের পেছনে নামায পড়লেও তাকবীরে তাশরীক বলিনি। পরবর্তীতে এক ব্যক্তির কাছ থেকে জানতে পারলাম, মুসাফির, মুকীম ইমামের একতেদা করলে তার উপরও তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব হয়ে যায়। জানতে চাচ্ছি, তার কথাটি কি সঠিক? সঠিক হলে আমার করণীয় কী?

উত্তর : বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী মুসাফির ব্যক্তির উপরও তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব। চাই একাকী নামায আদায় করুক কিংবা কোনো মুকীম বা মুসাফিরের একতেদা করুক সকল ক্ষেত্রে তাকে তাকবীরে তাশরীক বলতে হবে। তাই আপনার তাকবীরে তাশরীক না বলা ভুল হয়েছে। আর তাকবীরে তাশরীকের যেহেতু কোনো কাযা নেই তাই ঐ তাকবীর এখন আর আদায় করা যাবে না। এজন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে ইস্তিগফার করতে হবে। –আলবাহরুর রায়েক ২/১৬৬; আলমুহীতুল বুরহানী ২/৫০৯; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২১৬; রদ্দুল মুহতার ২/১৭৯

জানাযা-দাফন

আম্মার
বসুন্ধরা, ঢাকা

৪৩৭১ প্রশ্ন : একবার কুরবানী ঈদে লঞ্চডুবিতে অনেক মানুষ মারা যায়। নিহতদের উদ্ধারের পর আত্মীয়-স্বজনরা এসে যার যার লাশ নিয়ে যায়। অবশেষে এমন কিছু লাশ থেকে যায়, যাদের ঠিকানা ও স্বজনদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তখন স্থানীয়রা প্রতিটি লাশ গোসল দেওয়া ছাড়াই কাফন পরিয়ে জানাযার নামাযের পর দাফন করে দেয়। আমার জিজ্ঞাসা হল, মৃত্যুর পর নদীতে থাকার পরও কি গোসল দেওয়ার প্রয়োজন আছে? যদি থেকে থাকে তাহলে প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে গোসল দেওয়া ছাড়া জানাযার নামায পড়া কি ঠিক হয়েছে?

উত্তর : জীবিতদের উপর ফরয দায়িত্ব মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া। তাই পুকুর বা নদীতে পাওয়া গেলেও তাকে গোসল দেওয়া কর্তব্য। তবে নদী থেকে উঠানোর সময় যদি গোসলের উদ্দেশ্যে পানিতে নাড়া চাড়া দেওয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে গোসল দেওয়ার ফরয আদায় হয়ে যায়। তবে প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে জানাযার নামায শুদ্ধ হয়ে গেছে।

কেননা, জানাযার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হল লাশ পবিত্র হওয়া। আর পানিতে পাওয়ার কারণে লাশ পবিত্র ধরা হবে। –ফাতাওয়া খানিয়া ১/১৮৭; আদ্দুররুল মুখতার ২/২০০; আততাজনীস ওয়াল মাযীদ ২/২৪১; আলবাহরুর রায়েক ১/৬৫

সওম-ইতিকাফ

সাওফয়ান আহমাদ
ফরিদপুর

৪৩৭২ প্রশ্ন : আমাদের বাজার মসজিদে এক ব্যক্তি নিয়মিত রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করেন। গত বছর একদিন ইতিকাফ অবস্থায় তার এক আত্মীয়ের সাথে কথা বলতে বলতে ভুলে মসজিদ থেকে বের হয়ে যান। পরে ইতিকাফের কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই মসজিদে প্রবেশ করেন। তখন কেউ বলেছে, মসজিদ থেকে বের হওয়ার কারণে তার ইতিকাফ নষ্ট হয়ে গেছে। আবার কেউ বলেছে, সে যেহেতু ভুলে বের হয়ে গেছে তাই তার ইতিকাফ নষ্ট হয়নি। যেমন ভুলে খেয়ে ফেললে রোযা ভাঙ্গে না।

আমরা এ বিষয়ে সঠিক মাসআলা জানতে চাই।

উত্তর : ঐ ব্যক্তির ইতিকাফ ভেঙ্গে গেছে। এতেকাফকারী মসজিদ থেকে ভুলে বের হলেও ইতিকাফ ভেঙ্গে যায়। এটি রোযার মত নয়। তাই ইতিকাফকে রোযার সাথে তুলনা করা ঠিক হবে না। দ্বীনী কোনো বিষয় জানা না থাকলে বিজ্ঞ আলেম থেকে জেনে নেওয়া কর্তব্য। না জেনে নিজ থেকে মন্তব্য করা অন্যায়। –বাদায়েউস সানায়ে ২/২৮৫; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৬৮; আননাহরুল ফায়েক ২/৪৬; ফাতাওয়া খানিয়া ১/২২২; আলবাহরুর রায়েক ২/৩২০

আবদুস সালাম বিন আবুল বাশার
হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ

৪৩৭৩ প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ভবনটি পুরাতন হয়ে যাওয়ায় গত বছর পুনঃনির্মাণের জন্য ভাঙা হয়। আপাতত নামায পড়ার জন্য পাশে অবস্থিত মুতাওয়াল্লী সাহেবের জায়গায় টিনশেড দিয়ে একটি অস্থায়ী মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে ঈদ-জুমাসহ পাঁচ ওয়াক্তের নামায এই অস্থায়ী মসজিদেই আদায় করা হয়। এলাকার বিরোধের কারণে এখন পর্যন্ত নতুন ভবনের কাজ শুরু করা যায়নি। জানার বিষয় হল, সামনের রমযানে এ অস্থায়ী মসজিদে ইতিকাফে বসা সহীহ হবে কি না? সহীহ না হলে মহল্লাবাসী সুন্নত ইতিকাফ কীভাবে আদায় করবে?

উত্তর : সুন্নাত ইতিকাফের জন্য শরয়ী মসজিদ হওয়া জরুরি। অস্থায়ী নামায-ঘরে ইতিকাফ সহীহ নয়। তাই ইতিকাফকারীগণ অন্য কোনো মসজিদে গিয়ে ইতিকাফ করবেন। –বাদায়েউস সানায়ে ২/২৮০; তাবয়ীনুল হাকায়েক ২/২২৫; ইমদাদুল আহকাম ১/৪৪৭

তুফায়েল আহমদ
কানাইঘাট, সিলেট

৪৩৭৪ প্রশ্ন : গত ১৫ রবিউল আওয়াল রোযা রাখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রাতের বেলায় শরীরটা খারাপ লাগায় রাখব কি না তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যাই। তাই আর রাতে রোযার নিয়ত করতে পারিনি। সকালে কিছুটা সুস্থতা অনুভব হলে রোযা রাখার মনস্থ করি এবং দ্বিপ্রহরের আগেই নিয়ত করে ঐ দিনের রোযা রাখি। কিন্তু

ইফতারের পর হঠাৎ স্মরণ হয় যে, আমি রোযার নিয়ত করার আগেই ফজরের পর ভুলে পানি পান করেছিলাম। জানার বিষয় হল, ভুলে পানি পান করার পর নিয়ত করে এভাবে রোযা রাখা সহীহ হয়েছে কি না? সহীহ না হলে আমাকে কি উক্ত রোযার কাযা করতে হবে?

উত্তর : সকাল হওয়ার পর নফল রোযার নিয়ত করার অবকাশ থাকলেও সুবহে সাদিকের পর ভুলবশত কিছু খেয়ে ফেললে ঐদিন আর রোযার নিয়ত করা যায় না। তাই প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার ঐ দিনের রোযা সহীহ হয়নি। আর এটা যেহেতু রোযাই হয়নি তাই এর কাযাও করা লাগবে না।

উল্লেখ্য, দিনের বেলায় রোযার নিয়ত সহীহ হওয়ার বিষয়টি দ্বিপ্রহরের পূর্বের সাথে নয়; বরং সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মাঝখানের সাথে সম্পৃক্ত। আর এ দুইয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। রোযা সহীহ হওয়ার জন্য দিনের মধ্যখানের আগেই নিয়ত করে নিতে হবে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৬; হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদ্দুর ১/৪৪৯; রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৪, ৩৭৭

মাহমুদ হাসান
মুরাদনগর, কুমিল্লা

৪৩৭৫ প্রশ্ন : রমযানে যখন বিমানে সফর করা হয় তখন ইফতারের সময় নিয়ে বেশ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। কারণ, যে দেশ থেকেই সফর শুরু হয় এক সময় দেখা যায়, সে দেশের সময় অনুযায়ী সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু বিমান যমিন থেকে কয়েক হাজার ফিট উপরে থাকায় স্পষ্টভাবেই সূর্য দেখা যায়। বিশেষ করে বিমান যখন পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে যেতে থাকে। যেমন কেউ বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে বিমানে উঠল। এক্ষেত্রে বিমান যেহেতু পশ্চিম দিকে যাচ্ছে তাই দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা সূর্য চোখের সামনে থাকে। অথচ বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী সূর্যাস্ত হয়ে গেছে অনেক আগেই। এক্ষেত্রে বিমানের যাত্রীদের যদি সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় তাহলে দেখা যায় কখনো কখনো রোযার সময় প্রলম্বিত হয়ে ২০-২২ ঘন্টাও হয়ে যায়। তাই হুযুরের কাছে জানতে চাচ্ছি, এ ধরনের অবস্থায় আমরা কখন ইফতার করব? দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : বিমানের যাত্রীগণ নিজেরা যখন সূর্যাস্ত হতে দেখবে তখনই ইফতার করবে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে বিদেশের আকাশে থেকে বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী ইফতার করা যাবে না এবং যে এলাকার আকাশের উপর বিমান আছে সেখানের স্থলভাগের হিসেবেও নয়। এক্ষেত্রে যদি রোযা ২০-২২ ঘন্টারও হয়ে যায় তবুও সূর্যাস্ত না দেখে ইফতার করা যাবে না। তবে হ্যাঁ, কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত অবস্থায় রোযা পুরা করতে গেলে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে তাহলে সে রোযা ভেঙে ফেলতে পারবে এবং পরে এ রোযার কাযা করে নিবে।

উল্লেখ্য যে, সফর অবস্থায় যদি সুবহে সাদিক শুরু হয় অর্থাৎ রাতের শেষ ভাগে যদি কেউ সফরে থাকে তাহলে শুরু থেকেই তার জন্য রোযা না রাখার সুযোগ রয়েছে। পরবর্তীতে সে এর কাযা করে নিবে। -বাদায়েউস সানায়ে ২/২২৫; খিযানাতুল আকমাল ১/৩২৭; তাবয়ীনুল হাকায়েক ২/১৬৫; রদ্দুল মুহতার ২/৪২০; আলমাবসূত, সারাখসী ৩/৯১

যাকাত-সদাকা

সাইফুল্লাহ
সাভার, ঢাকা

৪৩৭৬ প্রশ্ন : আমার একজন বয়স্কা বিবাহিতা মেয়ে আছে। সে প্রতি বছর ঈদে আমাদের বাড়িতে আসে। এবার ঈদুল ফিতরের দিন যখন আমি অন্য সন্তানদের সদাকাতুল ফিতর আদায় করছিলাম তখন আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি যে, আমার ঐ মেয়ের সদাকাতুল ফিতরও কি আমাকে আদায় করতে হবে? কারণ তার বর্তমান যাবতীয় খরচ তো আমিই বহন করছি। হুযুরের কাছে এ ব্যাপারে সঠিক মাসআলা জানতে চাচ্ছি।

উত্তর : প্রাপ্তবয়স্ক বুঝমান সন্তানের সদাকাতুল ফিতর আদায় করা বাবার উপর ওয়াজিব নয়। তাই আপনার ঐ মেয়ের সদাকাতুল ফিতর আপনার আদায় করা জরুরি নয়। নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে সে নিজের সদাকাতুল ফিতর নিজেই আদায় করবে। অবশ্য আপনি যদি তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেন তবে তা আদায় হয়ে যাবে। -আলমাবসূত, সারাখসী ৩/১০৫; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৭৩; বাদায়েউস সানায়ে ২/২০২; ফাতাওয়া ওয়ালওয়ালিজিয়া ১/২৪৫

আবদুল মাজীদ
আকুয়া, ময়মনসিংহ

৪৩৭৭ প্রশ্ন : গত বছর আমার এক দরিদ্র আত্মীয় ময়মনসিংহ সরকারী হাসপাতালে ভর্তি ছিল। আমি তাকে হাসপাতালে দেখতে যাই। তার নিকট টাকা না থাকায় সে প্রয়োজনীয় ঔষধ কিনতে পারছিল না। তখন আমি যাকাত আদায়ের নিয়তে তাকে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও ফল কিনে দেই। জানার বিষয় হল, আমি তাকে যে ঔষধ ও ফল কিনে দিয়েছি তা যাকাত হিসাবে আদায় হয়েছে কি?

উত্তর : আপনার ঐ আত্মীয় যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হলে যাকাত আদায়ের নিয়তে ঔষধ ও ফল কিনে দেওয়া ঠিক হয়েছে এবং এর দ্বারা আপনার যাকাতও আদায় হয়েছে। কেননা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিকে যাকাতের নিয়তে কোনো দ্রব্য প্রদান করলেও যাকাত আদায় হয়ে যায়। তবে টাকা না দিয়ে কোনো বস্তু দিলে গরীবের প্রয়োজনে আসে এমন কিছু দেওয়াই উচিত। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, বর্ণনা ১০৫৩৮; বাদায়েউস সানায়ে ২/১৪২; আদ্দুররুল মুখতার ২/২৫২; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/১৫৩; তাবয়ীনুল হাকায়েক ২/১৮

আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ সালেহ
মাদারীপুর

৪৩৭৮ প্রশ্ন : আমি ব্যবহারের জন্য একটি পুরাতন গাড়ি কিনেছি। ইচ্ছা আছে, ভালো দাম পেলে বিক্রি করে দিব। ইতিমধ্যে এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন আমার অন্যান্য সম্পদের সাথে ঐ গাড়ীরও কি যাকাত দিতে হবে?

উত্তর : না, প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনাকে ঐ গাড়ির যাকাত দিতে হবে না। কেননা আপনার প্রাথমিক ইচ্ছা, গাড়িটি ব্যবহার করা। আর ব্যবহারের নিয়তে ক্রয় করা বস্তুর যাকাত দিতে হয় না।

প্রকাশ থাকে যে, পণ্য ক্রয়ের সময় একমাত্র বিক্রির নিয়ত করলে তা ব্যবসার মাল হিসেবে গণ্য হয় এবং তখনই তা যাকাতযোগ্য সম্পদ বলে গণ্য হবে। -বাদায়েউস সানায়ে ২/৯৪; ফাতাওয়া খানিয়া ১/২৫০; আলবাহরুর রায়েক ২/২২৮; ফাতহুল কাদীর ২/১৬৬

মুহাম্মাদ রিজওয়ানুল হক
মুহাম্মাদপুর

৪৩৭৯ প্রশ্ন : আমি মাস্টার্স শেষ করে বর্তমানে ব্যবসা করছি। আমাদের পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত মুহাম্মাদপুরে সাত তলা একটি বাড়ি আছে। এক তলায় আমরা থাকি, বাকিগুলো ভাড়া দেওয়া। দুইটি ফ্ল্যাটে আমাদের দুই আত্মীয় ভাড়া থাকে।

তারা ঠিকমত ভাড়া পরিশোধ করে না। কখনো দুই-তিন মাসের ভাড়াও বাকি পড়ে থাকে। আত্মীয় হওয়ায় চাপও দিতে পারি না। আমি সাধারণত ডিসেম্বরে ব্যবসার বাৎসরিক হিসাবের পাশাপাশি যাকাতেরও হিসাব করে ফেলি। এখন প্রশ্ন হল, বকেয়া বাড়ি ভাড়ার যাকাতের হিসাব কীভাবে করব?

উত্তর : বাড়ি ভাড়া উসূল না হওয়া পর্যন্ত তা যাকাতের হিসাবে আসবে না। যখন উসূল হবে তখন যাকাতযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অতএব হস্তগত হওয়ার পর যাকাতযোগ্য অন্যান্য সম্পদের সাথে বছরান্তে এর যাকাত দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, যাকাতের হিসাব করতে হয় চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী। আর চান্দ্রবর্ষ সৌরবর্ষ থেকে বছরে এগার দিন কম হয়ে থাকে। তাই ভবিষ্যতে এ বিষয়টিও খেয়াল রাখতে হবে। –আলবাহরুর রায়েক ২/২০৮, ২০৩; মিনহাতুল খালিক ২/২০৮; ফাতাওয়া খানিয়া ১/২৫৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭৫; আদ্দুররুল মুখতার ২/২৯৫

তানঈম
সাভার, ঢাকা

৪৩৮০ প্রশ্ন : গত মাসে আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব রোহিঙ্গাদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের জন্য একটি কাফেলা নিয়ে টেকনাফের উদ্দেশে যাত্রা করেন। সেখানে আমিও ত্রাণ হিসেবে তিন লাখ টাকা দিয়েছি। পরবর্তীতে ত্রাণ বিতরণের পূর্বেই সেই টাকাগুলো আমার যাকাত বাবদ আদায়ের নিয়ত করি। জানতে চাই, এভাবে নিয়ত করার দ্বারা কি আমার যাকাত আদায় হয়েছে? উল্লেখ্য, উক্ত কাফেলা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত রোহিঙ্গাদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছে।

উত্তর : হ্যাঁ, প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার যাকাত আদায় হয়েছে এবং এক্ষেত্রে যাকাতের নিয়ত করা সহীহ হয়েছে। কারণ, আপনি যাকাতের টাকা মওজুদ থাকা অবস্থায়ই যাকাতের নিয়ত করেছেন। আর যাকাতের টাকা গরীবের হাতে দেওয়ার পর তার খরচ করার আগ পর্যন্ত তাতে দাতার যাকাতের নিয়ত করা সহীহ। তাই আপনার ঐ নিয়ত করা সহীহ হয়েছে এবং এর দ্বারা আপনার যাকাত আদায় হয়ে গেছে। –খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৪৪; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/১৯৭; আলবাহরুর রায়েক ২/২১০; রদ্দুল মুহতার ২/২৬৮

হজ্ব-উমরা

ওয়াহীদুজ্জামান
সদর, কুমিল্লা

৪৩৮১ প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর উপর হজ্ব ফরয হয়ে আছে। কিন্তু বর্তমানে আমি দেশের বাইরে (আরব আমিরাতে) আছি। আমরা দু'জন একসাথে হজ্ব পালন করব। বাংলাদেশ থেকে আমার স্ত্রীকে শ্বশুর সৌদি এয়ারলাইন্স পর্যন্ত দিয়ে যাবেন আর আমি এদিক থেকে তাকে রিসিভ করব। এখন হুযুরের কাছে জানতে চাচ্ছি, বাংলাদেশ থেকে বিমানে সৌদি আসতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে। এমতাবস্থায় এই অল্প কয়েক ঘণ্টা মাহরাম ছাড়া সফর করতে কি কোনো প্রকার অসুবিধা আছে?

উত্তর : মহিলাদের জন্য মাহরাম পুরুষ ব্যতীত সফরসম দূরত্বে বের হওয়া জায়েয নয়। এছাড়া হাদীস শরীফে মহিলাদেরকে মাহরাম ব্যতীত হজ্বের সফরে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَت امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ : اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

কোনো পুরুষ যেন অপর মহিলার সঙ্গে একাকী অবস্থান না করে। আর কোনো মহিলা যেন তার মাহরাম ব্যতীত সফর না করে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি। আর আমার স্ত্রী হজ্বযাত্রী। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্ব করতে যাও। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩০০৬) অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لاَ تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

কোনো মহিলা যেন মাহরাম ব্যতীত হজ্ব না করে। (সুনানে দারাকুতনী, হাদীস ২৪৪০) আর কয়েক ঘণ্টার সফর হলেও এটি হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব। যেখানে আপনার স্ত্রীর সাথে কোনো মাহরাম থাকবে না। এছাড়া বর্তমান হজ্ব-আইন অনুযায়ীও কোনো মহিলা ভিসা পেতে হলে তার সাথে মাহরাম থাকা আবশ্যক। হজ্ব এজেন্সিগণ অনেক সময় ভুয়া মাহরাম দেখিয়ে থাকে। যা মিথ্যা ও প্রতারণার শামিল।

অতএব আপনার উচিত, দেশে এসে স্ত্রীকে নিয়ে হজ্বে যাওয়া অথবা এখান থেকে কোনো মাহরামের মাধ্যমে তার সৌদি পৌঁছার ব্যবস্থা করা। –আলমাবসূত, সারাখসী ৪/১১০; আত্তাজরীদ, কুদূরী ৪/২১৭০; রদ্দুল মুহতার ২/১২০; আলকিফায়া শরহুল হেদায়া ২/২; তাবয়ীনুল হাকায়েক ২/২৩৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩৮

উছমান গনি
মুরাদনগর, কুমিল্লা

৪৩৮২ প্রশ্ন : গত দুই বছর পূর্বে আমার বাবা হজ্বের ইরাদা করেন। তাঁর উপর হজ্ব ফরয ছিল। কিন্তু হঠাৎ এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এভাবে প্রায় এক বছর অতিবাহিত হয়। ফলে একসময় আব্বা সুস্থ হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে আমাদেরকে বদলী হজ্ব করানোর ওসিয়ত করেন। এ ঘটনার কিছুদিন পরই আব্বা ইন্তিকাল করেন।

আব্বার রেখে যাওয়া সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ প্রায় ২,৩০,০০০/- (দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকার মত হয়। কিন্তু এ টাকা দিয়ে বর্তমানে কাউকে হজ্বে পাঠানো যাচ্ছে না। তাই বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় একজন আলেমের সাথে আলোচনা করি। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে কেউ যদি স্বেচ্ছায় এ টাকার সাথে আর (বাকি) সামান্য টাকা নিজে বহন করে বদলী হজ্ব করে তাহলেও হয়ে যাবে।

আমাদের এ আলোচনা মসজিদে হওয়াতে আরও কয়েক ব্যক্তি তা শুনছিল। তন্মধ্যে একজন এগিয়ে এসে নিজ থেকেই বলে যে, আপনি যদি ২,৩০,০০০/- টাকা দেন তাহলে বাকি টাকা দিয়ে আমি আপনার বাবার বদলী হজ্ব করতে পারি।

তাই হুযুরের কাছে জানতে চাচ্ছি, উক্ত আলেমের কথা অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি যদি বাকি টাকা নিজ থেকে দিয়ে হজ্ব করেন তাহলে কি আমার বাবার ফরয হজ্ব আদায় হবে? দয়া করে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় বাকি টাকা দিয়ে আপনার বাবার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করে তাহলে আপনার বাবার বদলী হজ্ব আদায় হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ২,৩০,০০০/- টাকাতেও কোনো কোনো এজেন্সি হজ্বে নিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে তারা সুযোগ-সুবিধা কম দিয়ে থাকে। আর হজ্বের মূল খরচ (রেজি. ফি, টিকেট ও মুআল্লিম ফি ইত্যাদি) তো এ টাকার মধ্যেই হয়ে যায়। তাই আনুষঙ্গিক

অন্যান্য খরচ বদলীকারী দিলেও কোনো সমস্যা নেই। –আলমাবসূত, সারাখসী ৪/১৪৭; বাদায়েউস সানায়ে ২/৪৬০; ফাতাওয়া খানিয়া ১/৩১১; ফাতাওয়া ওয়ালওয়ালিজিয়া ১/২৮৬; তাবয়ীনুল হাকায়েক ২/৪৩০

আবদুল হালিম
রংপুর

৪৩৮৩ প্রশ্ন : হজ্ব করার নিয়তে অনেকদিন আগ থেকেই টাকা জমা করছিলাম এবং একসময় হজ্ব করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ টাকা জমাও হয়ে যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে ঘূর্ণিঝড়ে আমার ঘর-বাড়ি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে হজ্বের জন্য জমানো টাকা দিয়েই এর মেরামত ও সংস্কার করি। হুযুরের কাছে জানতে চাচ্ছি, এতে কি আমার কোনো গুনাহ হয়েছে? এবং আমার জন্য কি হজ্ব করা আবশ্যক? উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আমার কাছে হজ্ব করার মত অর্থকড়ি নেই।

উত্তর : হজ্বের উদ্দেশ্যে জমাকৃত টাকা দ্বারা ঘর-বাড়ি মেরামত করা অন্যায় হয়নি। এর জন্য গুনাহ হবে না। তবে এক সময় আপনার নিকট (প্রয়োজনাতিরিক্ত) হজ্বের খরচ পরিমাণ টাকা জমা থাকায় আপনার উপর হজ্ব ফরয। তাই ভবিষ্যতে ফরয হজ্ব আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। –আততাজনীস ওয়াল মাযীদ ২/৪৬৩; ফাতহুল কাদীর ২/৩২৪; গুনয়াতুন নাসিক পৃ. ২০; মাজমাউল আনহুর ১/৩৮৬

মুহাম্মাদ শামসুল আলম
ময়মনসিংহ

৪৩৮৪ প্রশ্ন : আমার এক প্রতিবেশী এ বছর তার ফরয হজ্ব আদায় করতে যাচ্ছে। আর তার স্ত্রী ইতিপূর্বে তার বড় ভাইয়ের সাথে আপন ফরয হজ্ব আদায় করেছে। এখন আমি চাচ্ছি, সে মহিলার সাথে কথা বলে তাকে দিয়ে আমার বাবার বদলী হজ্ব করাতে। তাই হুযুরের কাছে জানতে চাচ্ছি, এ মহিলাকে দিয়ে বদলী হজ্ব করালে কি তা আদায় হবে?

উত্তর : উক্ত মহিলা যেহেতু তার স্বামীর (তথা মাহরাম পুরুষের) সাথেই যাবে তাই তাকে দিয়ে বদলী হজ্ব করালে তা আদায় হবে। তবে বদলী হজ্বের জন্য পুরুষকে পাঠানোই উত্তম। –সহীহ বুখারী, হাদীস ১৮৫৫; উমদাতুল কারী ৯/১২৮; আলমাবসূত, সারাখসী ৪/১৫৫; আলবাহরুর রায়েক ৩/৬৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৭; আদ্দুররুল মুখতার ২/৬০৩

নিকাহ-তালাক

আব্দুল্লাহ
ঢাকা

৪৩৮৫ প্রশ্ন : আশা করি ভাল আছেন। দুআ করি, আমার অন্তরের আশা যেন আল্লাহ কবুল করেন। সেটা হল আপনার দীর্ঘ নেক হায়াত এবং সুস্থতা। জনাব! আমার জানার বিষয় হল, আমার চাচী মারা গেছেন ১ বছর হল এবং তার ২ ছেলে ও এক মেয়ে আছে। এখন আমার চাচা একজন মহিলাকে বিবাহ করে এনেছেন এবং সেই মহিলার আবার পূর্বের স্বামী থেকে একটা ছেলে ও একটা মেয়ে আছে। আমার চাচা তার পূর্বের স্ত্রীর ছেলেকে দ্বিতীয় স্ত্রীর মেয়ের সাথে এবং পূর্বের স্ত্রীর মেয়েকে দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলের সাথে বিবাহ দিয়েছেন। জানার বিষয় হল এটা কি জায়েয হয়েছে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত উভয় বিবাহ সহীহ হয়েছে। এ বিয়েতে শরীয়তের কোনো বাধা নেই। –আলবাহরুর রায়েক ৩/৯৩; রদ্দুল মুহতার ৩/৩১; তাবয়ীনুল হাকায়েক ২/৪৬২; হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদ্দুর ২/১৪

সিরাজুল ইসলাম
আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

৪৩৮৬ প্রশ্ন : কিছুদিন পূর্বে আমার এক প্রতিবেশী ইন্তেকাল করেন। তার আট-দশ বছর বয়সী দুটি ছেলে আছে। উভয়ে মাদরাসায় পড়াশোনা করে। এছাড়া সংসারে কর্মক্ষম কোনো পুরুষ নেই। লোকটির স্ত্রী এক মহিলা মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। মাদরাসাটি বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। মহিলাটি প্রতিদিন বিকেলে বাড়িতে চলে আসেন। আর বর্তমানে উক্ত মহিলার সংসারের খরচ চালানোর জন্য তার এ চাকরি ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা নেই।

প্রশ্ন হল, উক্ত মহিলার জন্য ইদ্দতের সময় এ চাকরি করা জায়েয হবে কি না?

মুফতী সাহেবের কাছে বিনীত নিবেদন, উপরে বর্ণিত মহিলার সার্বিক অবস্থাকে সামনে রেখে শরীয়তের আলোকে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন। যদি তার জন্য ইদ্দত অবস্থায় উক্ত চাকরি করা জায়েয না হয় তাহলে তার সংসারের খরচ নির্বাহ হবে কীভাবে? এ বিষয়ে শরীয়ত কী বলে? দয়া করে জানিয়ে উপকৃত করবেন। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

উত্তর : কুরআনে কারীমে ইদ্দতরত নারীর প্রতি গৃহাভ্যন্তরে অবস্থানের নির্দেশ এসেছে। তাই একান্ত জরুরত ছাড়া বাইরে বের হওয়া জায়েয হবে না। প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে বাস্তবেই যদি উক্ত চাকরি ছাড়া মহিলাটির চলার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে ইদ্দত অবস্থায় উক্ত চাকরিতে যাতায়াত করা জায়েয হবে। তবে জরুরতের কারণে বের হলেও রাতের বেলা অবশ্যই স্বামীর বাড়ীতেই থাকতে হবে। বাইরে থাকা যাবে না। –কিতাবুল আছল ৪/৪০৫; ফাতাওয়া খানিয়া ১/৫৫৪; আলবাহরুর রায়েক ৪/১৫৩; আলইখতিয়ার ৩/২৬৫; মাজমাউল বাহরাইন পৃ. ৫৯৬; ইলাউস সুনান ১১/২৫৫

হাসান আহমাদ
আকুয়া, ময়মনসিংহ

৪৩৮৭ প্রশ্ন : কয়েক বছর পূর্বে আমার মা ইন্তিকাল করেন। অতপর আমার পিতা আরেকটি বিবাহ করেন। সৎ মায়ের মা আমাদের এখানে মাঝে মাঝেই বেড়াতে আসেন। আমি তাকে নানী ডাকি এবং তার সামনে যাই। কিছুদিন পূর্বে একজন আলেম বললেন, সৎ মায়ের মায়ের সাথে পর্দা করা জরুরি। ঐ আলেমের কথা কি ঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : হ্যাঁ, ঐ আলেম ঠিকই বলেছেন। সৎ মায়ের মাতা মাহরাম নন। সুতরাং তার সাথেও পর্দা করতে হবে। কারণ, আমাদের দেশে সৎ মা বলা হয় আপন মা ব্যতীত বাবার অন্য স্ত্রীকে। বাবার স্ত্রী হওয়ার কারণে তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা জায়েয। তবে এ কারণে সৎ মায়ের ঊর্ধ্বতন কেউ মাহরামের অন্তর্ভুক্ত হবে না। –ফাতাওয়া খাইরিয়া ১/৩৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭৭; রদ্দুল মুহতার ৩/৩১

মুআমালা-লেনদেন

মুখলিছুর রহমান
বছিলা, ঢাকা

৪৩৮৮ প্রশ্ন : আমার এক বন্ধুর দুইটি পিকআপ আছে। আর আমার একটি বড় ট্রাক আছে। বর্তমানে আমার ব্যবসায়িক কাজের জন্য ছোট পিকআপের প্রয়োজন বেশি। বিভিন্ন জায়গায় মাল পাঠাতে ছোট পিকআপ বেশি সুবিধাজনক। আর আমার উক্ত বন্ধু বড় ট্রাক দিয়েও ভালো ইনকাম করতে পারবে। তাই আমি মাসিক হিসাবে আমার ট্রাক তাকে ভাড়া দিয়ে বিনিময়ে তার পিকআপ দুটি ভাড়ায় নিতে চাচ্ছি। অর্থাৎ যার যার মালিকানা বহাল থাকবে।

তবে আমার ট্রাক চালিয়ে যা ইনকাম হবে তা সে নেবে। বিনিময়ে তার পিকআপ দুটি আমি ব্যবহার করব। শরীয়তের দৃষ্টিতে এভাবে চুক্তি করার বিধান কী?

উত্তর : এভাবে চুক্তি করা অর্থাৎ বাহনের বিনিময়ে বাহন ভাড়া দেওয়া-নেওয়া নাজায়েয। তবে আপনারা উভয়ে টাকার হিসাবে নিজ নিজ বাহনের ভাড়া নির্ধারণ করে নিতে পারেন।

যেমন : বড় ট্রাকের ভাড়া ১০,০০০/- টাকা এবং ছোট দুটি পিকআপের ভাড়া ১০,০০০/- টাকা। এরপর প্রত্যেকের পাওনা ১০,০০০/- টাকা অপরের থেকে পাওনা দ্বারা কর্তনও করতে পারেন।

সুতরাং কোনো মাসে যদি আপনি পিকআপ না নিয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে তার ভাড়া দিতে হবে না। কিন্তু সে ট্রাক নিয়ে থাকলে তার ভাড়া আদায় করবে। –বাদায়েউস সানায়ে ৪/৪৮; শরহুল মাজাল্লাহ ২/৫৪১; আলমুহীতুল বুরহানী ১১/২১৮-২২০; মুলতাকাল আবহুর ৩/৫৪১; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৬২

মুহাম্মাদ ইমরান হুসাইন
মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা

৪৩৮৯ প্রশ্ন : ধান কাটার বা অন্যান্য ফসল তোলার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সাথে আমরা উক্ত ফসলেরই একটা অংশ দেওয়ার চুক্তি করি। অর্থাৎ কথা থাকে, তারা ক্ষেতের ধান বা ফসল তুলে বাড়িতে এনে দেবে, বিঘাপ্রতি তাদেরকে সেখান থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান বা ফসল দেওয়া হবে। তো ধান বা ফসল তোলা শেষ হলে তা বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকে তাদের অংশ নিয়ে যায়। এক ভাই বললেন, এটা নাকি জায়েয নয়। কিন্তু আমি তার কথার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। তাই আমি জানতে চাই, এ বিষয়ে শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক সিদ্ধান্ত কী?

উত্তর : শ্রমিকেরা যে ফসল কেটে আনবে সেখান থেকেই তাদের বিনিময় পরিশোধ করার শর্তে চুক্তি করা সহীহ নয়। কেননা এতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরি পাওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত বা অনির্ধারিত হয়ে পড়ে। যেমন, কোনো কারণে যদি ধান বা ফসল চিটা হয়ে যায় কিংবা শ্রমিকের আবহেলা ছাড়াই (যেমন : হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি, আগুনে পুড়ে যাওয়া কিংবা ফসল নিয়ে আসার পথে কোনো দুর্ঘটনায়) ফসল নষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তাদের কাটা ফসল নেই বিধায় মালিক তাদের মজুরি দিতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। অথচ এসব ক্ষেত্রেও শ্রমিক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাওয়ার হকদার। তাই ইসলামী শরীয়তে কর্তিত ফসল থেকেই বিনিময় নির্ধারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি হল, ক্ষেত বা বিঘাপ্রতি তাদেরকে কী ধরনের এবং কী পরিমাণ ধান বা ফসল দেওয়া হবে তা নির্ধারিত করে নেওয়া। আর তা এই ফসল থেকেই দেওয়া হবে, তা নিশ্চিত না করা। এভাবে চুক্তির পর পারিশ্রমিক দেওয়ার সময় চুক্তিকৃত শর্তের সাথে মিলে গেলে তাদের কেটে আনা ফসল থেকেও মজুরি পরিশোধ করা যাবে। আবার চুক্তিকৃত পণ্য অন্য জায়গা থেকে সংগ্রহ করেও দেওয়া যেতে পারে।

জেনে রাখা দরকার, শরীয়তের প্রতিটি বিধানেই মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। তাই আল্লাহ তাআলার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি নির্দেশ কারণ খোঁজ করা ছাড়াই পূর্ণ আস্থার সাথে মেনে নেওয়াই মুমিনের কাজ। –কিতাবুল আছল ৩/৪৩২, ৪৩৬; তাবয়ীনুল হাকায়েক ৬/১২৭; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৫/১১৫; শরহুল মাজাল্লা ২/৫৩৮; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৫৭

মুহাম্মাদ আমিরুল ইসলাম
সুজানগর, পাবনা

৪৩৯০ প্রশ্ন : আমাদের দুই ভাইয়ের একটি আমবাগান আছে। আমি ঢাকায় থাকি বিধায় সেটি দেখাশোনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই আমি আমার ভাইয়ের সাথে এভাবে চুক্তি করতে চাচ্ছি যে, সে এটি দেখাশোনা করবে। যা খরচ হবে তা আমাদের সম্মিলিত বলে গণ্য হবে। আর মোট লাভ থেকে তাকে নিচের দুই পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতে লাভ দেওয়া হবে।

১. ফল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত লাভ থেকে ২০% তাকে দিয়ে বাকিটা আমরা দুই ভাগে ভাগ করে নেব।

২. সারা বছরের জন্য তাকে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হবে। ফল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ থেকে তার পারিশ্রমিক প্রথমে প্রদান করা হবে। এরপর খরচ বাদে অবশিষ্ট টাকা দু'জন ভাগ করে নেব।

শরীয়তের দৃষ্টিতে উভয় পদ্ধতির বিধান কী? দয়া করে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার লিখিত প্রথম পদ্ধতিটি অবলম্বন করা যাবে না। দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ পারিশ্রমিক প্রদানের নীতিটি সংশোধন করে তা নিম্নোক্ত পন্থায় অবলম্বন করা যেতে পারে। তা হল, আপনার অংশের দেখা-শোনার জন্য নির্দিষ্ট অঙ্কের পারিশ্রমিক আপনি তাকে প্রদান করবেন– এ মর্মে একটি চুক্তি হবে। সেক্ষেত্রে বাগানে ফল কম-বেশি যাই হোক সে তার নির্ধারিত পারিশ্রমিক পাবে। আর সম্পূর্ণ ফল আপনাদের মালিকানা অনুপাতে বণ্টন হবে। আপনি চাইলে তাকে আপনার ফল বিক্রি করে তা থেকে পূর্বে নির্ধারিত পারিশ্রমিক দিতে পারেন। আর ফল যদি তার চেয়ে কম হয় তাহলে নিজ থেকে আপনার ভাইয়ের পারিশ্রমিকের টাকা দিতে হবে। –বাদায়েউস সানায়ে ৫/২৭০; মাজমাউল আনহুর ৩/৫৪১; শরহুল মাজাল্লাহ, আতাসী ৪/৩৯৯; আদ্দুররুল মুখতার ৬/২৯২

মারুফ হাসান
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ

৪৩৯১ প্রশ্ন : আমি দশ লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে একটি দোকান শুরু করতে চাচ্ছি। আমার এক বন্ধু এবং আমি এটি দেখাশোনা ও পরিচালনা করব। আমি একটি চাকরি করি। তাই বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত দোকানে থাকব। ছুটির দিনেও থাকব। আর সে পুরো সময় থাকবে এবং যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেবে। চুক্তি হবে, খরচ বাদ দিয়ে যা লাভ থাকবে তা থেকে ৩০% নেবে সে, আর ৭০% নেব আমি। শরীয়তের দৃষ্টিতে আমাদের উক্ত চুক্তিতে কোনো সমস্যা আছে কি? দয়া করে জানাবেন।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত পদ্ধতির চুক্তি শরীয়তসম্মত নয়। এক্ষেত্রে শতকরা হারে লাভ বণ্টনের চুক্তি সহীহ নয়। কেননা আপনার বন্ধু শুধু শ্রম দিচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে আপনার বন্ধুর জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেওয়ার পর আপনি চাইলে তাকে মুনাফা থেকেও শতকরা হারে একটি অংশ দিতে পারবেন। –আলমাবসূত, সারাখসী ২২/৮৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৪১২; আলমুহীতুল বুরহানী ১১/২১৭; তাবয়ীনুল হাকায়েক ৫/৫২১; আদ্দুররুল মুখতার ৫/৬৪৮

ওসমান গনী
রায়েরবাগ, ঢাকা

৪৩৯২ প্রশ্ন : আমার একটি নতুন জুব্বা দোকানে আয়রন করতে দিয়েছিলাম। কাপড় আনার পর দেখি, সেটির ৭/৮ জায়গা পুড়ে ছিদ্র হয়ে গেছে। সেটি ছিল পাতলা সুতি কাপড়ের। হালকা টান লাগলেই ছিদ্র বড় হয়ে যেতে থাকে। ফলে এখন আর সেটি পরার উপযুক্ত নেই। দোকানের মালিককে বিষয়টি জানানো হলে বলল, নতুন লোক কাজ করতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে। তো জুব্বাটি বানাতে যত টাকা খরচ হয়েছে তার অর্ধেক টাকা আমি দিয়ে দেব। কিন্তু আমার কথা হল, তার তো সেটির পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা উচিত। কারণ, সেটি ছিল নতুন কাপড়। তো শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ব্যাপারে কী বিধান তা জানতে চাই।

উত্তর : এক্ষেত্রে মাসআলা হল, পুড়িয়ে ফেলা পোষাকের বাস্তব মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায় করা। এক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের জন্য কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতাও নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য কাপড়ের মালিক যদি কম টাকা নিতে রাজি হয়ে যায় তবে তার অবকাশ আছে। –শরহু মুখতাসারিত তহাবী ৩/৩৯৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৫০০; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, মাদ্দা : ৬১১; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৬৬

মুহাম্মাদ মুহসিন
উত্তরা, ঢাকা

৪৩৯৩ প্রশ্ন : আমার দোকানের কর্মচারীরা অনেক সময় কোনো জিনিস নষ্ট করে ফেলে বা তাদের অনিচ্ছায় কিংবা অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে তাদের থেকে জরিমানা নেওয়ার বিধান কী? এক্ষেত্রে তাদেরকে ছাড় দেওয়া হলে তাদের অবহেলা বাড়তেই থাকে। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাদের থেকে জরিমানা নেওয়া যাবে এবং কখন যাবে না– বিস্তারিত জানালে খুবই উপকৃত হব।

উত্তর : দোকানের পণ্য কর্মচারীদের হাতে আমানত। সাধ্যমত এগুলো হেফাযতের চেষ্টা করা তাদের দায়িত্ব। এ ব্যাপারে তাদেরকে সবসময় সজাগ থাকতে হবে। তবে এরপরও যদি তাদের অবহেলা বা সীমালঙ্ঘন ছাড়াই কোনো কিছু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এর জন্য তাদের থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়া যাবে না। আর যদি তারা ইচ্ছাকৃত কোনো কিছু নষ্ট করে কিংবা দায়িত্বে অবহেলা বা সীমালঙ্ঘনের কারণে বা তাদেরকে যেভাবে বলা হয়েছে তার বিপরীত কাজ করার কারণে কোনো কিছু নষ্ট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বাস্তব ক্ষতিপূরণ নেওয়া যাবে। অর্থাৎ যে জিনিসটি নষ্ট করেছে এর মূল্য বা তার থেকে কম গ্রহণ করা যাবে। –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, বর্ণনা ২০৮৬৭; শরহু মুখতাসারিত তহাবী ৩/৩৯৯; তাবয়ীনুল হাকায়েক ৬/১৪৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৫০০

মুহাম্মাদ আবদুল লতিফ
শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ

৪৩৯৪ প্রশ্ন : আমি আমার এক বন্ধুর সাথে ব্যবসায় শরীক হতে চাচ্ছি। অর্থাৎ ব্যবসায় সে দেবে আট লক্ষ টাকা, আর আমি দেব দুই লক্ষ টাকা। ব্যবসা সে-ই পরিচালনা করবে। মাঝে মধ্যে সুযোগ হলে আমিও কিছু কাজ করব। সে মোট লাভের ২০% আমাকে দেবে, আর বাকিটা তার থাকবে। এভাবে চুক্তি করতে কোনো সমস্যা আছে কি?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত হারে লাভ বণ্টনের ভিত্তিতে চুক্তি করা সহীহ হবে। ব্যবসায় লাভ হলে আপনি চুক্তিকৃত হারে লাভ পাবেন। আর লোকসান হলে তা উভয়কে নিজ নিজ পুঁজি অনুপাতে বহন করতে হবে। –বাদায়েউস সানায়ে ৫/৮৩; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, মাদ্দা : ১৩৭০; শরহুল মাজাল্লাহ, খালিদ আতাসী ৪/২৯৪; তাবয়ীনুল হাকায়েক ৪/২৪৫

মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান
তেজগাঁও, ঢাকা

৪৩৯৫ প্রশ্ন : আমার ভাগিনা একটি দোকান করেছে। তার পুঁজি ছিল তিন লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে তার টাকা প্রয়োজন হলে আমি তার ব্যবসায় দুই লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করি। তার সাথে এভাবে চুক্তি হয়েছে, দোকানের সকল খরচ বাদ দিয়ে যা লাভ থাকবে তা দু'জনের মাঝে অর্ধার্ধি হারে বণ্টন হবে। আর লোকসান হলে উভয়ে মূলধন অনুপাতে তা বহন করবে। আমার এ বিনিয়োগ শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না? দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে অর্ধার্ধি হারে লভ্যাংশ বণ্টনের চুক্তি করা সহীহ হয়নি। কেননা, উক্ত কারবারে আপনার কোনো শ্রম নেই। আর যৌথ মূলধনী কারবারে শ্রম না দিয়ে শুধু মূলধন বিনিয়োগ করলে নিজ মূলধনের চেয়ে বেশি হারে লভ্যাংশ নেওয়া বৈধ নয়।

অতএব, আপনার জন্য বিনিয়োগকৃত মূলধনের আনুপাতিক হারে সর্বোচ্চ ৪০% লভ্যাংশ গ্রহণ করা বৈধ হবে। এর অতিরিক্ত গ্রহণ করা বৈধ হবে না। সুতরাং এ অনুযায়ী চুক্তিটি সংশোধন করে নিতে হবে।

উল্লেখ্য, শরীকানা বা যৌথমূলধনী কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট শরীয়তের অনেক মাসআলা রয়েছে। তাই এ ধরনের কোনো কারবার শুরু করার সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী বিজ্ঞ আলেমদের থেকে তা জেনে নেওয়া কর্তব্য। –কিতাবুল আছল ৪/৫২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৩২০; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৩৮৬; বাদায়েউস সানায়ে ৫/৮৩; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, মাদ্দা : ১৩৭২

কুরবানী-আকীকা

ইবনে ছিদ্দিক
নারায়ণগঞ্জ

৪৩৯৬ প্রশ্ন : আমরা তিন ভাইয়ের দুই জন চাকরিজীবী এবং সচ্ছল। আর আমি পড়ালেখা করছি। আমার এক বিবাহিতা বোন আছে। তার পরিবারও সচ্ছল। আমার পিতা নিজের পক্ষ হতে সকলের ওয়াজিব কুরবানী আদায় করতে চান। শরীয়তে কি এর অনুমতি আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, আপনার পিতা আপনাদের পক্ষ হতে কুরবানী করলে তা সহীহ হবে এবং আপনাদের ওয়াজিব কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। আমাদের সমাজে পিতা কর্তৃক সন্তানদের কুরবানী ও ফিতরা দিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। তাই এক্ষেত্রে ভিন্ন করে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে যদি কোনো এলাকায় এমন রেওয়াজ না থাকে এবং সন্তান পিতার সাথে একান্নভুক্তও না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে পিতা সন্তানের পক্ষ থেকে কুরবানী করলে সন্তানের অনুমতি নিয়ে নিবেন বা সন্তানদের অবগত করবেন। এতেই সকলের কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। –আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৭৩; ফাতাওয়া কাযীখান ৩/৩৪৫; ফাতাওয়া বায্যাযিয়া ৬/২৯৫; রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৫ ●

আল্লাহকে ভয় করুন, ...

(২৪ পৃষ্ঠার পর)

তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাক। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ কী? তিনি বললেন– ১. আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা, ২. জাদু করা, ৩. অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা, যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। ৪. সুদ খাওয়া, ৫. এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, ৬. জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যাওয়া। ৭. সতী-সাধ্বী সরলমনা-উদাসীনা মুমিন নারীদের বিরুদ্ধে অপকর্মের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। –সহীহ বুখারী, হাদীস ২৭৬৬, ৬৮৫৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৮৭৪; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৩৬৭১

দুই. হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি স্বপ্নের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে–

'আমি দেখলাম আজ রাতে আমার কাছে দু'জন মানুষ আসল এবং তারা আমাকে একটি পবিত্র ভূখণ্ডে নিয়ে গেল। আমরা চলতে চলতে একটি রক্তের নদীর কিনারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেই নদীতে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। আর নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন পুরুষ। তার সামনে রয়েছে পাথর। যখন নদীর লোকটি কিনারে উঠতে চায় তখন কিনারে থাকা লোকটি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে। পাথরের আঘাতে লোকটি যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যায়। এরপর সে আবারও নদীর কিনারে উঠতে চায়, এভাবে সে যখনই কিনারে উঠতে চায় তখনই তাকে পাথর মেরে যেখানে ছিল সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

আমি আমার সাথে থাকা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, রক্তের নদীতে অবস্থিত লোকটি, যার মুখের উপর পাথর মেরে আপন জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে লোকটি কে? তখন তাদের একজন আমাকে বললেন, এ লোকটি সুদখোর।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৮৬, ২০৮৫

তিন. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে–

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ.

যে ব্যক্তি সুদ খায় এবং যে সুদ খাওয়ায় উভয়কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৫৯৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ১২০৬; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৫১০৪

চার. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে ৭টি গুনাহকে বড় গুনাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হল সুদ খাওয়া। –মুসনাদে বাযযার; আল মু'জামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ১০২; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ৫৭০৯

পাঁচ. অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ.

যে সুদ খায়, যে সুদ খাওয়ায়, যে সাক্ষী থাকে এবং যে ব্যক্তি সুদের হিসাব-নিকাশ বা সুদের চুক্তিপত্র ইত্যাদি লিখে দেয় সকলের প্রতি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন। –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৬০; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৩৩; জামে তিরমিযী, হাদীস ১২০৬

এ ছাড়াও আরও অসংখ্য হাদীসে সুদ খাওয়া, সুদ দেওয়া এবং সুদের সাথে কোনোরূপ সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

এই ভয়াবহতম হারাম কর্মটিকেই এখন বানিয়ে ফেলা হয়েছে অতি উপাদেয় একটি বিষয়। মতলববাজ লোকেরা সকল শ্রেণির মুসলমানদের এতে জড়ানোর জঘন্যতম কাজটি করে যাচ্ছে বিনা বাধায়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাকওয়া ও হেদায়েতের পথে চলার তাওফীক দান করুন। •

তলাবায়ে কেরাম! মনোযোগ নষ্ট করবেন না এখন ইলম অর্জনে নিবিষ্ট থাকুন

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

ইলম অন্বেষণ পূর্ণ নিবিষ্টতা চায়।

لكل شيء آفة وللعلم آفات.

'সবকিছুর একটি বিপদ আছে, কিন্তু ইলমের রয়েছে অনেক বিপদ।' এ উক্তি তো পুরনো। কিন্তু এর সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হয়তো এ সময়টি। এজন্য এখন মনোযোগের কমতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইলম অর্জনের আনুষ্ঠানিক স্তরটি হচ্ছে কঠিন কোরবানীর সময়। আগে এ কোরবানীর বড় ক্ষেত্র ছিল খোর-পোশের মান-পরিমাণে কমতি, আবাসন সংকট, যোগাযোগের জটিলতা এবং উপায়-উপকরণের অপ্রতুলতা। এখন সাধারণভাবে এসবের কোনো কমতি নেই। প্রায় সবখানেই আসবাব ও উপকরণের ছড়াছড়ি। এখন কোরবানীর যে প্রকৃত ক্ষেত্র, তা সর্বত্র ও সর্বযুগের জন্য কোরবানীর ক্ষেত্র ছিল। সে ক্ষেত্র অতীতের তুলনায় এখন বেশি মুজাহাদা ও কোরবানীর প্রত্যাশী।

আজ শুধু একটি কথাই নিবেদন করছি, প্রথম প্রথম তো ছাত্রদেরকে মোবাইলের কথা বলতাম– এটা আপনার জন্য নয়, এটা আপনার জন্য উপকারের চেয়ে বেশি ক্ষতি বয়ে আনার পর্যায়ে পড়ে। মোবাইল আপনার জন্য প্রাণসংহারী বিষ। তখন পর্যন্ত মোবাইল আর ইন্টারনেট ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েনি। এখন তো মোবাইল আর ইন্টারনেট পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। এখন তো ছাত্রদের জন্য মোবাইল আর বিষ থাকেনি; বরং সরাসরি খুনি। কিন্তু পরিস্থিতি হল, আসাতিযায়ে কেরামের সব উপদেশ পরিহার করে, প্রতিষ্ঠানের সব আইন-কানুনের খেলাফ করে মোবাইলের সঙ্গে সম্পর্ক দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। সব অভিযোগ আল্লাহরই কাছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

যে ভাইয়েরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করে পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করেছেন, তারা যদি নিজ শিক্ষকের অনুমতি ও দিক-নির্দেশনায় ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমকেও ইল্‌ম ও দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করতে চান তাহলে নীতি-বিধান মেনে আল্লাহর ওপর ভরসা করে ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু ছাত্রদের জন্য মোবাইলে জড়িয়ে পড়া কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের বড়রা কোনো নওজোয়ান আলেমকে অনুমতি দিয়ে থাকলে তা শর্তসাপেক্ষ অনুমতি। এতে ছাত্রদের একথা বোঝা ঠিক নয় যে, তারও অনুমতি হয়ে গেছে। এ তো সুস্পষ্ট ভুল তুলনা।

কয়েকদিন আগে হযরতপুর মাদরাসাতুল মদীনায় গিয়েছিলাম, দেখেছি, আদীব হুযুর এ বিষয় নিয়েই পেরেশান। তিনি বলছিলেন, 'শোনা যায়, এখন নেটে কোনো কোনো মুরুব্বির বক্তব্য আসে, তরুণ আলেমরা তাদের সাক্ষাৎকার নেয়, মুরুব্বিরা তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য সাক্ষাৎকার দেন, বক্তব্য দেন। এতে তাঁদের নিয়ত তো নিশ্চয়ই ভালো। নিয়ত তো হল, এই ময়দানেও তরুণ আলেমরা কাজ করুক। কিন্তু তাঁদের তাশজী'কে মুতলাক ধরে নিয়ে মাদরাসার তালিবুল ইলমরাও ভাবে, মুরুব্বিরা তো ইজাযত দিয়েছেন। কিছু মুরুব্বি না দিক, মুরুব্বিদের ইজাযত তো আছে। আর এটার জরুরত তো আমরা মাহসুস করছি, সেইসাথে ইজাযতও আছে। সুতরাং সোনায় সোহাগা। সেইজন্য এখন মুবতাদী তালিবুল ইলমরাও নাকি দাওয়াতী নিয়তে ফেসবুক ব্যবহার করে। এটা আমি মনে করি, একেবারে আত্মঘাতী।

যতক্ষণ পর্যন্ত তলবে ইলমের প্রাতিষ্ঠানিক স্তর সম্পন্ন না হবে, দায়িত্বশীলতার বয়সে যতক্ষণ না উপনীত হবে; –অনেকে তো এই বয়সে এসেও উপনীত হয় না– সেটা আলাদা কথা, কিন্তু আমাদেরকে তো একটা মিয়ারে আসতে হবে। মিয়ার হল, প্রাতিষ্ঠানিক তালীম থেকে ফারেগ হওয়া। এই স্তরে পৌঁছলে তখন একজন মানুষকে তার নিজের দায়িত্বের উপর ছেড়ে দেওয়া যায়। তো যদি মনে করে যে, কোনো একজন মুরুব্বির তত্ত্বাবধানে আমি এই কাজটা করব, মুরুব্বির অধীনে– মুরুব্বিকে ব্যবহার করে নয়, তাহলে আমি তাকে খুশিমনে ইজাযত দিবো– ঠিক আছে, তুমি তোমার মুরুব্বির অধীনে কাজটা করো। তবে শুধু সাবধান করে দেব যে, এই পথের প্রতি মোড়ে মোড়ে ফণা তোলা সাপ ছোবল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে। এর একটা ছোবল যিন্দেগী বরবাদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এটা মনে রেখে সামনে চলো। কিন্তু তলবে ইলমীর প্রাতিষ্ঠানিক স্তর সম্পন্ন করার আগে আমি কখনো ইজাযত দিব না। কারণ এ বিষয়ে আমার শরহে সদর আছে যে, জাওয়াল এবং শাবাকা ধ্বংসের পথ।

'অথচ এটা এখন মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা এখন বড় ফেতনায় পড়ে গেছি। মাদরাসার ভেতরেও আমরা রোধ করতে পারছি না। কারণ নফসের তাকাযা তো আছেই, আর যদি একটু বাহানা খুঁজে পায়...

আমি যেটা বলছিলাম, এরা যে মুরুব্বির দুআ নিয়ে করছে বলে– আসলে মুরুব্বিকে ব্যবহার করা এক জিনিস আর মুরুব্বির হাতে ব্যবহৃত হওয়া ভিন্ন জিনিস। এখনকার তরুণদের অনেকে কিন্তু মুরুব্বিদেরকে ব্যবহার করছে। আমি যদ্দূর বুঝি, তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে, তাদেরকে দেখিয়ে যে, উনারা আছেন আমাদের সঙ্গে, উনারা আমাদের জন্য দুআ করছেন, এটাকে আমি মুরুব্বির অধীনে কাজ করা বুঝি না। আমি বুঝি, মুরুব্বি তাদেরকে পরিচালনা করবেন। শুধু দুআ দিবেন আর ব্যবহৃত হবেন– এটা না। এটা হলে কোনো লাভ নেই। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন।'

পূর্ণ কল্যাণকামনার ভিত্তিতে মনের গভীর থেকে উৎসারিত এ উপদেশ যদি আজ আমরা মূল্যায়ন না করি, তাহলে পরবর্তীতে পরিতাপ তো করতে পারব। কিন্তু পরিতাপ কখনো অতীত ফিরিয়ে আনতে পারে না। আর পরিতাপ করে সব গাফলতের কাফফারা সম্ভব হয় না। আশা করি, তলাবায়ে কেরাম এ বাস্তবতা উপলব্ধির চেষ্ট করবেন।

এখন আমাদের আসল উদ্দেশ্য হল, অর্জন করা এবং গঠিত হওয়া। এ পথে সবার আগে বাধা হল, মোবাইল ও ইন্টারনেট। এজন্য কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই এ থেকে বেঁচে থাকুন। আল্লাহ আপনাকে দ্বীন ও ইল্‌মে দ্বীনের জন্য কবুল করুন– আমীন। ●

আমার মুহসিন কিতাব–৬

মাওলানা আবদুল আযীয মাইমান রাহ.

[মাওলানা আবদুল আযীয মাইমান রাহ. ১৩০৬ হিজরীর ১৩ সফর/ ১৮৮৮ ঈসাব্দের ২৩ অক্টোবর গুজরাটের কাটিওয়ার প্রদেশের রাজকোটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রাজকোটের বিখ্যাত মাইমান বংশের।

নিজ এলাকা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য দিল্লী, লখনৌ এবং রামপুরে সফর করেন। তাঁর উস্তাযগণের মধ্যে রয়েছেন– শায়েখ মুহাম্মাদ তায়্যিব মাক্কী রাহ., মাওলানা মুহাম্মাদ বশীর সাহসাওয়ানী রাহ. এবং ডেপুটি নযীর আহমদ রাহ. প্রমুখ। তিনি হাদীসের দরস ও ইজাযত লাভ করেন শায়েখ হুসাইন ইবনে মুহসিন আলআনসারী রাহ.-এর কাছ থেকে।

তাঁর আগ্রহ ও পাণ্ডিত্যের বিষয় ছিল আরবী সাহিত্য। এই শাস্ত্রে তিনি এতটাই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন যে, সমকালীন আরব সাহিত্যিকগণও ছিলেন তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সেজন্য একপর্যায়ে ১৯২৮ সালে তাঁকে 'আলমাজমাউল ইলমিল আরাবি'র রোকন নির্বাচিত করেন তারা। অথচ পুরো উপমহাদেশে কেবল একজনই এই মর্যাদা লাভ করেছিলেন তাঁর আগে। তিনি হাকীম আজমল খান রাহ.।

আরবী সাহিত্যের আধুনিক ও প্রাচীন ধারার প্রচুর গদ্য-পদ্য তিনি পড়েছেন। মুখস্থ করেছেন এবং আত্মস্থ করেছেন। এক মজলিসে সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ.-এর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, পৌনে এক লাখ থেকে এক লাখ আরবী কবিতা তাঁর মুখস্থ।

কর্মজীবনে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ও প্রাজ্ঞ শিক্ষক। পেশোয়ারের মিশন কলেজে আরবী ও ফারসী ভাষার শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। এরপর শিক্ষকতা করেছেন লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে। ১৯২৯ সালে যোগ দিয়েছেন আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২২ বছর সেখানে তিনি বিভিন্ন পদে নিযুক্ত ছিলেন। কয়েক বছর ছিলেন আরবী শাখার প্রধান।

১৯৫৪ সালে তিনি পাকিস্তান হিজরত করেন। সেখানে করাচি ইউনিভার্সিটিতে আরবী সাহিত্যের শিক্ষক এবং পরে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতে আরবী শাখার প্রধান নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামীর ডাইরেক্টর হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৩৫৬ হিজরীতে তিনি আরববিশ্ব ও তুর্কিস্তান সফর করেন এবং বহু মূল্যবান মাখতূতাত সম্পর্কে অবগতি লাভ করেন। দুর্লভ মাখতূতাতের খোঁজ-খবরের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তাঁর যুগের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের অন্যতম। আরবের বড় বড় ব্যক্তিরাও এ বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনে উপকৃত হতেন।

তাঁর বিখ্যাত রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে– 'আবুল আলা ও মা ইলাইহি' ও 'সামতুল লাআলী' ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি বহু কিতাব ও দিওয়ান (কবিতা সংকলন)-এর তাহকীক করেছেন। আরবী সাহিত্যের এই কিংবদন্তি মনীষী ১৩৯৭ হিজরীর ২৬ যিলকদ/১৯৭৮ ঈসাব্দের ২৭ অক্টোবর রোজ শুক্রবার করাচি থেকেই আখিরাতের সফরে রওয়ানা হয়ে যান। করাচি কবরস্তান সোসাইটিতে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।– অনুবাদক]

প্রথম প্রথম যখন আমি কাটিওয়ার থেকে দিল্লী আসলাম তখন উর্দূ-ফারসি কোনোটাই খুব ভালো পারতাম না। সেজন্য প্রথম তিন বছর শুধু নাহু-সরফের প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যেই গিয়েছে। এভাবে শরহে জামী পর্যন্ত পৌঁছার পর হঠাৎ যেন আল্লাহর তাওফীকই আমাকে রাহনুমায়ী করল। মনে হল, আমার পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে না। তাই সবকিছু ছেড়ে দিয়ে খুব মেহনতে লেগে গেলাম। আসাতিযায়ে কেরামের মেহনতের বাইরেও ব্যক্তিগত মুতালাআ শুরু করলাম। তখন এই নিম্নোক্ত কিতাব ও বিভিন্ন শরহ মুতালাআ করেছি এবং খুব উপকৃত হয়েছি।

সরফ শাস্ত্রে– 'শাফিয়া' ও তার বিভিন্ন শরহ, নাহ্ব শাস্ত্রে– 'আলফিয়াহ' ও তার বিভিন্ন শরহ, 'মুফাসসাল', 'আলআশবাহ ওয়ান নাযায়ের' এবং হাতে লেখা কয়েকটি মুতূন; যেমন, ইসফারায়েনীর 'লুব্বুল আলবাব' এবং ইবনে মালেকের 'তাসহীলুল ফাওয়ায়েদ' ইত্যাদি। তো এই কিতাবগুলোর মাধ্যমে আমি ফুকাহা ও মানতিক বিশারদদের তরযে লেখা নাহ্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি।

'কাফিয়া'র বেশকিছু ভুল মাসআলা আমাকে তখন নাহ্ব থেকে বিমুখ করেছিল। যেমন,

لا يضاف موصوف إلى صفته ولا صفة إلى موصوفها، و"جامع الغربي" ونحوه شاذ.

অথচ পুরো আরবী ভাষা এই জাতীয় ইযাফতে ভরপুর। এমনিভাবে আরো কিছু বিষয়, যেগুলোতে নানা ব্যাখ্যার দরজা খোলা হয়েছে এবং অন্যায়ভাবে একজন নাহ্ব-শিক্ষার্থীকে অর্থহীন গবেষণা, চাপ ও মসিবতে ফাঁসানো হয়েছে– বিষয়গুলো আমার মনে বেশকিছু কিতাবের প্রতি মন্দ ধারণা সৃষ্টি করেছে। মনে হয়েছে, তালিবুল ইলমের উদ্দেশ্য তো আরবী শেখা, কোনো ব্যক্তির সমর্থন করা নয়।[১]

এরপর 'মুফাসসাল' এবং সীবাওয়াইহ্র 'আলকিতাব' মুতালাআ আমাকে সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী করেছে। নাহ্বের বিভিন্ন কায়দার উদাহরণ অনুসন্ধান আমাকে দিওয়ান ও শুরূহের দিকে নিয়ে গেছে।

সাহিত্যের নানাবিধ পড়াশোনা আমাকে এই ধারণা দিয়েছে যে, আমরা ভুল পথে ছুটছি। কারণ প্রথমে আমাদের প্রচুর শব্দার্থ মুখস্থ করা উচিত। এই শব্দার্থ মুখস্থ করার আগে প্রয়োজন হল ছুলাছী মুজাররাদের বাবগুলো ভালোভাবে পড়ে নেয়া। এটা অবশ্য বেশ কঠিন একটি কাজ। কারণ এতে কিয়াস, চিন্তা-ভাবনা বা ধারণা-অনুমান কোনো সহায়তা করতে পারে না।

যাইহোক, শব্দার্থ মুখস্থ করার জন্য 'কিফায়াতুল মুতাহাফফিয', 'ফিকহুল লুগাহ' (সাআলাবী), 'আলফাযুল কিতাবিয়্যাহ' (হামাযানী), 'নিযামুল গারীব' এবং আরেকটু আগ বেড়ে 'ইসলাহুল মানতেক' ও 'তাহযীবুল আলফায' ইত্যাদি কিতাবগুলোর দিকে দৃষ্টি দিয়েছি এবং প্রচুর শব্দার্থ মুখস্থ করেছি।

একসময় মুখস্থ করেছি 'মুআল্লাকাতে আশ্‌র'। সেইসাথে আরো পাঁচ-সাতটি কবিতার বই, যেগুলোকে আরবী সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেওয়া হত এবং মুআল্লাকাতের পর্যায়ে গণ্য করা হত।

এছাড়াও সাহিত্য ও কবিতা সংকলনের যে কিতাবগুলো থেকে বড় একটা অংশ মুখস্থ করেছি সেগুলো হল– 'দেওয়ানে মুতানাব্বী', 'দেওয়ানে হামাসা' (এই দুটো সম্ভবত পুরোই মুখস্থ করেছিলাম), 'জামহারাতু আশআরিল আরব', 'মুফাদদালিয়াত', 'নাওয়াদেরে আবী যায়েদ', মুবাররাদের 'কামেল', 'কিতাবুল বায়ানি ওয়াত তাবয়ীন', 'আদাবুল কাতিব' ও তার শরহ 'আলইকতিযাব'।

আমি 'দেওয়ানে হামাসা', 'দেওয়ানে মুতানাব্বী', 'মাকামাত' ও 'সাকতুয যানদ' পড়েছি ডেপুটি নযীর আহমাদ সাহেবের কাছে। ডেপুটি সাহেবের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি তরজমা করতেন বড় চমৎকার। এমনিতে আরবী কবিতায়ও তাঁর রুচি, দক্ষতা আর পাণ্ডিত্য ছিল

১. কাফিয়া সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন এটি তাঁর মত। অন্যান্য শাস্ত্রবিদদের বক্তব্য তো আমাদের জানাই আছে।

অসাধারণ। এছাড়া তাঁর সাহিত্য-যোগ্যতা ছিল একেবারেই খোদাপ্রদত্ত।

তিনি আমার সঙ্গে বড় বিনয়ী আচরণ করতেন। কিন্তু আফসোস! 'সাকতুয যানদে'র একটি কবিতার কারণে তাঁর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়ে যায়! সেখানে তিনটি লাইন ছিল এমন–

وعلى الدهر من دماء الشهيدي + ن
علي ونجله شاهدان
فهما في أواخر الليل فجرا + ن وفي
أولياته شفقان
ثبتا في قميصه ليجيئ الحش + ر
مستعديا إلى الرحمن

এখানে 'ছাবাতা' (তাসনিয়া মুযাককার গায়েব)কে ডেপুটি সাহেব 'ছাবতান' মাসদার হিসাবে পড়লেন। আমি বললাম, এতে তো পদ্যটি গদ্য হয়ে গেল। এরপর আমি ছন্দ ভেঙ্গে ভেঙ্গে কবিতাটি খুলে দেখালাম। তখন ডেপুটি সাহেব বললেন–

شعر می گویم بہ از آب حیات
من ندانم فاعلاتن فاعلات

আমার কাব্যপাঠ আবে হায়াতের চেয়েও দামী।/আমি কবিতার ছন্দ জানি না।

(অর্থাৎ কবিতার ছন্দ রক্ষা করা আমার জন্য আবশ্যক নয়।)

আমি বললাম,

لیکن من می دانم فاعلاتن فاعلات چہ کنم

কিন্তু আমি তো ছন্দ জানি, তাই আর কী করা! (অর্থাৎ ছন্দ ছাড়া আমি কবিতা মেনে নিতে প্রস্তুত নই।)

এটা ১৯০৬ বা ১৯০৭ সালের দিকের ঘটনা। এরপর আমি ডেপুটি সাহেবকে কষ্ট দেইনি। যদিও তার বিনয়ের কারণে আশা ছিল তিনি আমাকে তাঁর থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিবেন।

আরবী কবিতায় ডেপুটি সাহেবের আশ্চর্য দক্ষতা ছিল। তাঁর কিছুটা অনুমান এই ঘটনা থেকেও করা যায়। একবার দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে আমীর হাবীবুল্লাহ খান সাহেব তাশরীফ আনলেন। ডক্টর নযীর আহমদ সাহেবের এক ছাহেবজাদা এফএ পড়ছিলেন। সেসময় 'মুনতাখাব দেওয়ানে আবিল আতাহিয়া' নেসাবে ছিল। সেখান থেকে এই কবিতাটি আমীর সাহেবের সামনে পড়ার জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল–

لا يذهبن بك الأمل
حتى تقصر في الأجل

তালিবুল ইলম বলল, এই পংক্তিগুলো পড়তে আমার তিন মিনিট লাগবে, আপনি আরো কিছু পংক্তি বাড়িয়ে দিন। ডেপুটি সাহেব তখন এইটুকু বাড়িয়ে দিলেন এবং বড় চমৎকার গাঁথুনি গাঁথলেন।

الله قدر في الأزل + ألا نجاة بلا عمل
النصح ليس بنافع + والسيف قد سبق العذل
والمرء ليس بخالد + والعيش أمر محتمل
كن حيث شئت من السهو + ل وفي
البروج وفي القلل
يدركك موت في الزما + ن ولا يزيدك
في الأجل
لذات دنيا كلها + سم مشوب بالعسل
العمر فان فالنجا + والموت آت فالعجل
حتى م تقليد الهوى + وإلى م تجديد الحيل
المبتلى بعلائق الد + نيا حمار في الوحل

আযলের দিনেই আল্লাহ তাআলা এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, আমল ছাড়া মুক্তি নেই।/ (সবসময়) নসীহত উপকারে আসে না। আর তরবারি নিন্দাকে ভেদ করে যায়।/ মানুষ দুনিয়াতে স্থায়ী নয়। আরাম আয়েশও অস্থায়ী।/ তুমি যেখানেই থাক; সমতলে, সুরঙ্গে, দুর্গে। নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু তোমাকে ধরেই ফেলবে। কোনোভাবেই সেই নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবে না।/ নিশ্চয়ই দুনিয়ার সব উপভোগ্য যেন বিষ মেশানো মধু। / জীবন তো শেষ হয়েই যাবে। সুতরাং মুক্তির ব্যবস্থা নাও। / মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ব্যবস্থা নাও দ্রুত।/ আর কতদিন প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে?/ কতদিন খুঁজে মরবে নতুন নতুন বাহানা?/ দুনিয়ার শতধা সম্পর্কে জড়িয়ে আছে যে ব্যক্তি,/ নির্ঘাত সে কর্দমায় আটকে যাওয়া গাধার মতো।

ডেপুটি সাহেবের সাহিত্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অনুমান করা যেতে পারে নিম্নোক্ত ঘটনাটি থেকেও।

একবার তিনি আমীর হাবীবুল্লাহ খান সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ঘটনাক্রমে সেটি ছিল ঈদের দিন। ডেপুটি সাহেব কবি মুতানাব্বীর ঈদ ও প্রিয়জনের চেহারা সম্পর্কিত কবিতা আবৃত্তি করলেন। সে কবিতায় 'ইয়াওমুল ঈদ' ও 'ওয়াজহুল হাবীব' বাক্যদুটিতে যুগপৎ ঈদের দিন এবং আমীর সাহেবের নাম 'হাবীব' উল্লেখিত হওয়ায় আমীর সাহেব খুব খুশি হলেন।

সবশেষে আরবী সাহিত্যের কয়েকটি কিতাব সম্পর্কে আমার অনুভূতি পেশ করছি : আমার নিকট 'আলগারীবুল মুসান্নাফ' (ইবনে সাল্লাম) এবং 'ইসলাহুল মানতিক' ঐ ধরনের কিতাব, যেগুলো একজন সাহিত্যিকের জন্য মুখস্থ থাকা জরুরি। আমাদের হাতে এমন কোনো সমৃদ্ধ কিতাব নেই, যার লেখকের কাছে ঐ লেখকের মতো উঁচু মানের তথ্যভাণ্ডার ছিল। তিনি প্রতিটি নাহ্বী মাসআলায় (যদি সে মাসআলার সম্পর্ক হয় কোনো কবিতার সঙ্গে তাহলে) কাব্য ও কবিতার প্রাচীন থেকে প্রাচীন ভাণ্ডার থেকে এত জরুরি তথ্য এনে দেন, যার নজির মিলে কেবল 'খিযানাতুল আদব' জাতীয় কিতাবে। তিনি পূর্বের ও পরের নাহবীদের কিতাবাদি এত পরিমাণে পড়েছেন এবং তাঁর কাছে এত বিশাল ভাণ্ডার ছিল, যার দৃষ্টান্ত পাওয়া মুশকিল। বলা হত, এখনো তাঁর জন্ম হওয়ার সময় আসেনি। একুশ শতকে তাঁর জন্ম হওয়া উচিত ছিল।

হামাসা বা বীরত্বগাঁথার কবিতা সংকলনের মধ্যে আবু তাম্মামের কবিতা নির্বাচন খুব ভালো হয়েছে। তবে বিন্যাস, শিরোনাম ও মন্দ বিষয় পরিহারের বিবেচনায় বুহতুরীর হামাসা সেরা। তবে বীরত্বগাঁথার দুর্লভ কবিতার বিবেচনায় আবু তাম্মামের 'ওয়াহশিয়্যাত' অনন্য। এই সংকলনটি 'আলহামাসাতুস সুগরা' নামে বেশি পরিচিত। কাব্য সমালোচনায় 'হামাসাতুল খালিদিয়্যাইনি'র চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো কিতাব পাওয়া যায় না। 'আলহামাসাতুল বসরিয়্যাহ' ও 'আলহামাসাতুল মাগরিবিয়্যাহ' খুবই সাধারণ জিনিস। প্রথমটি কনস্টান্টিনোপলের কুতুবখানায় আছে। দ্বিতীয়টি হায়দারাবাদেও আছে। এছাড়া আমার কাছেও এর দুটি নুসখা আছে।

কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ইবনে রুশাইকের 'কুরাযাতুয যাহাব', ইবনে শারফের 'রিসালাতুল ইবতিকার', 'হামাসাতুল খালিদিয়্যাইন', 'শরহুল মুখতার মিন আশআরি বাশশার' কিতাবগুলো সব ধরনের কবিতারই তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য ভালো। এছাড়া কাব্য সমালোচনার অনেক দিক বিবেচনায় ইবনে রুশাইকের 'কিতাবুল উমদাহ' সুন্দর। মারযুবানীর 'আলমূশিহ ফী মাআখিযিল উলামাই আলাশ শুআরা'ও খুব চমৎকার। কবিতা বোঝার জন্য 'আললাআলী শরহু আমালিল কালী' ভালো কিতাব।

ইবনে খালদূন যে কিতাবগুলোকে সাহিত্যের উসূল হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন সেগুলো সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল, মুবাররাদের 'কামেল' প্রাথমিক শ্রেণির ছাত্রদের জন্য বেশি উপকারী। 'আদাবুল কাতিব' খুব ধীরস্থিরভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লে কেউ ভাষাবিদ হতে পারবে। 'কিতাবুল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন'-এ বিশুদ্ধ গদ্য-পদ্যের নমুনা উপরোক্ত চার কিতাবের চেয়ে বেশি আছে। আর দুর্লভ শব্দভাণ্ডারের জন্য আবু আলী আলকালীর 'আলআমালী' সবচে' সুন্দর। ●

অনুবাদ : **তাওহীদুল ইসলাম তায়্যিব**

নবীজীর দস্তরখানে

আবু আহমাদ

৩০. ঘর থেকে ও দস্তরখান থেকে শয়তান তাড়াও

তুমি কি চাও তোমার ঘরে শয়তান রাত্রিযাপন করুক? অথবা তোমার দস্তরখানে শয়তান তার চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে বসে পড়ুক? না, তা হতে পারে না। শয়তানকে ঘরেই ঢুকতে দিব না; দস্তরখানে বসা তো 'দূর কি বাত'। কী করলে শয়তানের জন্য তোমার ঘরের দরজা বন্ধ হবে এবং শয়তানটা তোমার দস্তরখানের ধারে-কাছেও আসতে পারবে না– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শিখিয়েছেন।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন–

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ.

কেউ যখন ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের সময় ও খাবারের সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয় তখন শয়তান (তার চেলা-চামুণ্ডাদের) বলে, (তোরা অন্যখানে দেখ) এখানে তোদের রাত্রিযাপনের সুযোগ নেই, খাবারেরও ব্যবস্থা নেই। আর ব্যক্তি যদি ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহ্‌র নাম না নেয় তখন শয়তান (তার চেলা-চামুণ্ডাদের) বলে, এখানে তোমাদের রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আর খাবারের সময়ও যদি আল্লাহ্‌র নাম না নেয় তখন বলে, (এসো! তোমরা সবাই এখানে এসো!!) এখানে তোমাদের রাত্রিযাপন ও খাবার উভয় ব্যবস্থাই হয়েছে। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২০১৮

ঘরে ঢোকার সময় কোন্ দুআর মাধ্যমে আল্লাহর নাম নিতে হবে– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তা শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যখন কেউ ঘরে প্রবেশ করে সে যেন এই দুআ পড়ে–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ، وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই– কল্যাণপূর্ণ প্রবেশ, কল্যাণপূর্ণ প্রস্থান, আল্লাহ্‌র নামে প্রবেশ করলাম, আল্লাহ্‌র নামেই বের হলাম এবং আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করলাম। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫০৯৬

এ তো গেল ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়া। আর খাবারের শুরুতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়ার জন্য বিসমিল্লাহ বললেই হয়ে গেল। সাথে সাথে এক্ষেত্রে নবীজী আমাদের আরেকটি দুআও শিখিয়েছেন, যাতে আল্লাহর নামের সাথে সাথে বরকতের দুআও রয়েছে। সামনের শিরোনামে আমরা সে দুআটি শিখব।

৩১. খাওয়া শুরু করার একটি দুআ

এখন আমরা যে দুআটি শিখব তা খাওয়ার শুরুতে পড়তে হয়। শয়তান খাবারের বরকত নষ্ট করে দেয়। এই দুআ পড়লে শয়তানও ভিড়তে পারবে না তোমার দস্তরখানের কাছে, সাথে তোমার খাবারেও বরকত হবে। এ খাবারের মাধ্যমে দেহ যেমন শক্তি সঞ্চয় করবে তেমনি আত্মাও পাবে নূর। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাওয়া খাবারের দ্বারা শরীর যেমন শক্তিশালী হয়, কলবও হয় নূরানী–আলোকিত।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রা. ও ওমর রা. আবু আইয়ূব আনসারী রা.-এর বাড়িতে এলেন। তাঁদের সামনে কয়েক প্রকার সুস্বাদু খাবার পেশ করা হল। তাঁরা তৃপ্তিভরে খেলেন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

...إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَضَرَبْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ فَكُلُوا بِسْمِ اللهِ وَبَرَكَةِ اللهِ.

...যখন তোমাদের সামনে এমন সুস্বাদু খাবার পেশ করা হয় এবং তোমরা খাবার শুরু কর তখন বল–

بِسْمِ اللهِ وَبَرَكَةِ اللهِ

আল্লাহ্‌র নামে এবং তাঁর বরকত নিয়ে শুরু করছি। –মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭০৮৪; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৪২৮৪; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ২২৪৭; আলমুজামুস সগীর, হাদীস ১৮৫

৩২. কাঁচা পেয়াজ-রশুন খেলে...

আজকে বিরিয়ানি রান্না হয়েছে। দুপুরের দস্তরখানে খুব মজা হবে। বিরিয়ানির সাথে সালাদ তো থাকবেই, কিন্তু কাঁচা পেঁয়াজ না হলে কি চলে। লোকমায় লোকমায় কাঁচা পেঁয়াজ–খাওয়ার রুচি বাড়িয়ে দেয়। খুব খেলাম পেঁয়াজ দিয়ে বিরিয়ানি। কিন্তু পেঁয়াজের গন্ধ আমি যতটুকু টের পাচ্ছি না পাচ্ছি– যেই মানুষটার সাথে আমি কথা বলছি, তিনি ঠিকই টের পাচ্ছেন এবং কষ্ট পাচ্ছেন। একটি হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا.

যে পেঁয়াজ-রশুন খেয়েছে (এর দুর্গন্ধ দূর করা ছাড়া) সে যেন আমাদের (মজলিস) থেকে অথবা বলেছেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৪৫২

তাই বলে কি কাঁচা পেয়াজ-রশুন খাওয়া নিষেধ? না, তা নয়। মদীনায় হিজরত করে নবীজী যখন আবু আইয়ূব আনসারী রা.-এর বাসায় অবস্থান করছিলেন তখন একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দস্তরখানে একটি খাবার দেওয়া হল। নবীজী তা খেলেন না। আবু আইয়ূব রা. চিন্তায় পড়ে গেলেন– নবীজী খেলেন না কেন? কারণটা তার মুখ থেকেই শুনি–

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ، وَبَعَثَ بِفَضْلِه إِلَيَّ، وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا، لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا، فَسَأَلْتُهُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُه مِنْ أَجْلِ رِيحِه.

(তিনি বলেন,) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে খাবার পেশ করলে তিনি খেতেন এবং বেঁচে যাওয়া অংশ পাঠিয়ে দিতেন। একদিন তিনি খাওয়া ছাড়াই একটি খাবার পাঠিয়ে দিলেন। (আমি বুঝতে পারলাম) তাতে রশুন থাকার কারণে তিনি তা খাননি। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম– রশুন (খাওয়া) কি হারাম? তিনি বললেন, না, তবে এর দুর্গন্ধের কারণে আমি তা পছন্দ করি না। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২০৫৩

তাহলে কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া যাবে। প্রয়োজন শুধু খাওয়ার পর ভালো করে মুখের দুর্গন্ধটা দূর করা। 'দুর্গন্ধ' তো দূর করারই বিষয়; তা আমার মুখে থাকবে কেন? সুতরাং কাঁচা পেঁয়াজ খেলে ভালো করে মুখ পরিষ্কার করব, দুর্গন্ধ দূর করব; যাতে অন্যের কষ্ট না হয়।

৩৩. আওয়াজ করে ঢেকুর তুলব না

কোথাও মেহমান হিসেবে খেলাম বা নিজের বাসায়। খাবারটা বেশ মজাদার হয়েছে। খাবার শেষে তৃপ্তির ঢেকুর এল। বেশ আওয়াজ করে মস্ত বড় একটা ঢেকুর তুললাম। আশপাশের মানুষগুলো একটু বিরক্ত হল। আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করলাম না।

এটি ঠিক নয়; ভদ্রতার খেলাফ। খাবার শেষে যদি ঢেকুর আসে তাহলে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে তা প্রতিহত করার। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত আওয়াজ যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তেমনি মুখে হাত দিয়ে বা রুমাল দিয়ে অসুন্দর দৃশ্যটি অন্যদের থেকে আড়াল করারও চেষ্টা করতে হবে।।

একবার নবীজীর সামনে এক ব্যক্তি (আওয়াজ করে) ঢেকুর তুলল। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন–

كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ.

তুমি (যথাসাধ্য) তোমার ঢেকুর প্রতিহত কর (প্রতিহত করার চেষ্টা কর)। –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪৭৮ ●

ভো গ বা দ

নারীর উন্নতি

মেয়েদের ভাগ্য কি বদলাবে না? প্রজন্মের পর প্রজন্ম মেয়েরা কি এভাবেই প্রতারিত হতে থাকবে? ভোগবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা নিজেদের স্বার্থে মেয়েদের পরিণত করেছে ভোগ্য-পণ্যে। অল্প কিছু অর্থ আর প্রচুর প্রশংসা-বাক্যের জালে আটকা পড়ে গেছে মেয়েদের পবিত্রতা ও কমনীয়তা। স্বার্থান্বেষী মহলের মোহনীয় কথায় প্রতারিত হয়ে তাদের অনেকে অতি অল্পমূল্যে বিকিয়ে দিচ্ছে আপন জীবন-যৌবন, শান্তি-স্বস্তি, পবিত্রতা ও নির্মলতা। হারিয়ে ফেলছে আখিরাতের জীবনের মুক্তি ও সাফল্যের সাথে পার্থিব জীবনেরও শান্তি ও মর্যাদা। ভয়াবহ মাত্রায় তারা আজ শিকার ইভটিজিং ও যৌন হয়রানির, এমনকি হত্যা ও ধর্ষণের।

এই যখন দেশীয় ও বিশ্ব পরিস্থিতি তখন অনূর্ধ্ব ১৫ সাফ ফুটবলের নামে কিশোরী মেয়েদের ফুটবলের মাঠে নামিয়ে দেওয়া যে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করারই প্রয়াস– তা ব্যাখ্যা করে না বললেও চলে। সম্প্রতি বাংলাদেশে তথাকথিত বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের বাছাই নিয়ে যা কিছু হয়েছে তা কারো অজানা নয়। ঐ সময় আধুনিক ঘরানারও কোনো কোনো নারী এই প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন যে, আমাদের মেয়েদের শক্তি-সামর্থ্য ও সক্ষমতা প্রকাশের জন্য আমরা কি তাহলে অন্য কোনো মঞ্চ তৈরি করতে পারিনি? এই একই প্রশ্ন কি মেয়েদের ফুটবল খেলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়? আমাদের মেয়েদের সক্ষমতার প্রমাণ দিতে হবে শত শত পুরুষের সামনে ফুটবল খেলে! আর এই অশ্লীলতাকে হজম করে আমাদের এই সমাজকে জাতে উঠতে হবে!! ধিক!

কে না জানে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে খেলাধুলা তা নিছক খেলাধুলা নয়, পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর আয়-উপার্জনের এক বড় মাধ্যম। এটাকে নির্মল খেলা-ধুলা আখ্যা দেওয়া অন্ধকে হাইকোর্ট দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়। এই খেলাধুলার মধ্যে যদি খোলামেলা তরুণী-যুবতীদের অংশগ্রহণ করিয়ে বাড়তি উপাদান সরবরাহ করা যায় তাহলে তা হয়ে ওঠে একশ্রেণীর দর্শক আকর্ষণ ও আয়-উপার্জনের পক্ষে আরো বেশি সহায়ক। ভোগবাদী পুরুষের কাছে নারীর খেলাধুলা কি শুধু খেলা উপভোগ করা, না নারীর নারীত্বও উপভোগ করা?

এই বাস্তবতা মাথায় রেখে কেউ যদি আমাদের একশ্রেণির মিডিয়ার পিঠ চাপড়ানোর ভাষা ও ধরন লক্ষ্য করেন তখন এদের ঘৃণ্য মানসিকতার উপর থুথু নিক্ষেপ না করে উপায় থাকে না। সত্যিই কি এই সুবেশী পুরুষগুলো বিশ্বাস করেন, কিশোরী মেয়েদের ফুটবলের মাঠে নামিয়ে বিপুল করতালির মাধ্যমে তারা তাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করছেন? তাদের কি কর্তব্য নয় বিবেককে প্রশ্ন করা? এরা কি নিজের কিশোরী মেয়েটিকেও নামিয়ে দিতে পারবেন শত শত পুরুষের দৃষ্টির সম্মুখে ফুটবলের মাঠে?

আমরা মনে করি, সামান্য কিছু অর্থ আর প্রচুর প্রশংসার ফাঁকা বুলির শিকার না হয়ে আদর্শ ও পবিত্রতার আলোয় আলোকিত হওয়াই নারীর প্রকৃত শান্তি ও মর্যাদার পথ। বর্তমান পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর পথ তাই অনেক পিচ্ছিল ও বিপদসঙ্কুল। বখাটে সন্ত্রাসীর চাপাতি-হুঙ্কার আর সুবেশী সুশীলের প্রলোভন থেকে তাকে রক্ষা করতে হবে নিজের জান-প্রাণ, বিশ্বাস-আদর্শ, পবিত্রতা ও নির্মলতা। এই কঠিন মুহূর্তে নারীর পাশে দাঁড়াতে হবে মুমিন পুরুষকেই। সোচ্চার হতে হবে বর্তমান জাহিলিয়াতের সন্ত্রাস আর ভণ্ডামির বিরুদ্ধে।

বিশ্বজুড়ে চলছে নারীকে বিচ্যুত ও ব্যবহার করার এক মর্মন্তুদ ধারা। এর

‘সামান্য কিছু অর্থ আর প্রচুর প্রশংসার ফাঁকা বুলির শিকার না হয়ে আদর্শ ও পবিত্রতার আলোয় আলোকিত হওয়াই নারীর প্রকৃত শান্তি ও মর্যাদার পথ। বর্তমান পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর পথ তাই অনেক পিচ্ছিল ও বিপদসঙ্কুল। বখাটে সন্ত্রাসীর চাপাতি-হুঙ্কার আর সুবেশী সুশীলের প্রলোভন থেকে তাকে রক্ষা করতে হবে নিজের জান-প্রাণ, বিশ্বাস-আদর্শ, পবিত্রতা ও নির্মলতা। এই কঠিন মুহূর্তে নারীর পাশে দাঁড়াতে হবে মুমিন পুরুষকেই। সোচ্চার হতে হবে বর্তমান জাহিলিয়াতের সন্ত্রাস আর ভণ্ডামির বিরুদ্ধে।’

লিখেছেন– গোলাম এলাহী

কুশীলবেরাই নানা পন্থায় মুসলিম দেশগুলোতেও এই ধারার বিস্তার ঘটিয়ে চলেছে। ভোগবাদী এই সমাজের প্রয়োজন পুরানো প্রজন্মের পর নতুন প্রজন্মের নারী ভোগ ও ব্যবহারের ধারাকে অব্যাহত রাখবার জন্য। মুসলিম দেশগুলোতে একশ্রেণির সুবেশী ভদ্রলোক একদিকে যেমন উৎসাহিত করে ভোগবাদী এই ধারাকে, অন্যদিকে নারীর ইজ্জত-আব্রু রক্ষার পবিত্র ধারাটিকে আখ্যায়িত করে ‘কুসংস্কার’ ইত্যাদি শব্দে। মেয়েদের ফুটবল সংক্রান্ত দৈনিক প্রথম আলোর এক লেখায় বলা হয়েছে, ‘খেলাধুলায় মেয়েদের অংশগ্রহণ নিয়ে একটা সময় যে কুসংস্কার ছিল এলাকার মানুষের মধ্যে, সেটিও দূর হয়েছে তহুরাদের সৌজন্যে।’ (দৈনিক প্রথম আলো, ২৯-১২-২০১৭)

এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বীনদার মুসলমান ছেলে-মেয়েদের শালীন জীবনের ধারায় থাকার ও রাখার যে শুভকামনা হৃদয়ে লালন করেন তাকেই আখ্যায়িত করা হচ্ছে কুসংস্কার বলে? আর নগ্নতা, অশ্লীলতা, নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হওয়ার ধারাটিকে সংস্কৃতিমনা বলে? শব্দ-বাক্যের এই প্রতারণার নামই কি সত্যের আলো? অথচ এই প্রথম আলোতেই প্রকাশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল ‘১৩ বছরেই হয়রানির শিকার নাতালি পোর্টম্যান।’ এই রিপোর্টের শুরুটা এইভাবে– যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে এবার মুখ খুললেন হলিউডের আরেক অভিনেত্রী

নাতালি পোর্টম্যান। ... লিও; দ্যা প্রফেশনাল চলচ্চিত্রের সেটে ১২ বছরে পা দিয়েছিলেন নাতালি পোর্টম্যান। এটি ছিল তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র। এর এক বছর পর প্রথম বারের মতো ভক্তের কাছ থেকে চিঠি পান। সেটি ছিল এক পুরুষের লেখা তাঁকে ধর্ষণ কল্পনার আখ্যান'। ...

ওই হলিউড অভিনেত্রী আরো বলেন, ১৩ বছর বয়সে আমার সংস্কৃতির কাছ থেকে যে বার্তা পেয়েছিলাম, তা আমার কাছে ছিল পরিষ্কার। আমার শরীর ঢেকে রাখতে হবে এবং অভিব্যক্তি প্রকাশে সংযত হতে হবে। (দৈনিক প্রথম আলো ২২ জানুয়ারি পৃ. ৭) কাজেই আজ কিশোর মেয়েদের ফুটবলের মাঠে নামিয়ে দিয়ে হাত তালি দেওয়া সুবেশী লোকগুলোর মুনাফিকী সম্পর্কে আমাদের নারীদের যেমন সচেতন হতে হবে তেমনি সর্বস্তরের মুসলিমদেরও সোচ্চার হতে হবে। আমাদের সাহস সঞ্চয় করতে হবে সত্যকে সত্য বলার এবং মিথ্যা ও অন্ধকারকে মিথ্যা ও অন্ধকার বলার। ●

❛ এমন একটি সুমহান ছাত্রসংগঠনের ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তাদের কেন্দ্রীয় সভাপতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল একটি টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে। সেখানে তিনি অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে অতি আস্থার সাথে বলেছেন, 'না তো! দেশে কোথাও প্রশ্নফাঁস হচ্ছে না।' উপস্থাপিকা ভাবলেন, তিনি হয়ত শুনতে ভুল করেছেন। তিনি প্রশ্নটি আবার করলেন। এবার সভাপতি সাহেব আরো স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'যেখানে আমাদের জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায়, সেখানে প্রশ্নফাঁসের মত কোনো ঘটনা ঘটতেই পারে না।' এবার উপস্থাপিকা যেন মাটি থেকে আকাশে পড়লেন। দিনের বেলা প্রখর রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘর্মাক্ত শরীরে কেউ যদি বলে 'আহ! রাতের এই আকাশে কী চমৎকার জোছনা!' তাহলে নির্বাক হওয়া ছাড়া আর কী উপায় থাকে!?❜

শি ক্ষা - দী ক্ষা

প্রশ্নফাঁসে হাঁস-ফাঁস

লিখেছেন– হারিছ তবীল

রফিক সাহেব অফিসে যাচ্ছেন। বাসে বড্ড ভিড়। এই দেশে অফিস টাইমে বাসে ভিড় হওয়া, এমনকি বাস না পেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকাও অতি স্বাভাবিক। কিন্তু আজ রফিক সাহেব অস্বাভাবিক একটা বিষয় লক্ষ্য করলেন। বাসের সামনের দিকে স্কুলড্রেস পরা কিছু ছেলে গাদাগাদি করে বসে কয়েকটা স্মার্টফোনের ওপর ঝুঁকে আছে। রফিক সাহেব ভাবলেন হয়ত খেলা-টেলা কিছু দেখছে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ল এখন তো খেলার মওসুম না, এখন মওসুম এসএসসি পরীক্ষার এবং যদ্দুর বোঝা যাচ্ছে এরা এসএসসি পরীক্ষার্থী; পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে।

রফিক সাহেব কিঞ্চিত ধাঁধায় পড়ে গেলেন। কারণ পরীক্ষার আগমুহূর্তে মোবাইল টেপাটেপির চিত্রের সাথে তিনি পরিচিত নন। পরীক্ষার দিন সকাল হতে বাসায়, এরপর গাড়িতে, এরপর স্কুলের বারান্দায় বা মাঠে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নোট বা গাইড নিয়ে পড়ে থাকতেন। এরপর ঘণ্টা পড়লে আল্লাহ্‌র নাম নিতে নিতে হলে ঢুকতেন। প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এরা মোবাইল টিপছে কেন? সব মুখস্থ হয়ে গেছে, নাকি স্বপ্নে প্রশ্ন পেয়ে গেছে?

কৌতূহল সামলাতে না পেরে তাদের কাছে গিয়ে প্রশ্নটা তিনি করেই ফেললেন। এক কিশোর বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'আরে আংকেল ডিস্টার্ব কইরেন না! যেই প্রশ্ন রাতে আউট হওয়ার কথা সেইটা আউট হইছে একটু আগে। এক হাজার টাকায় প্রশ্ন কিনছি, একটু শান্তিমত দেখতে দেন।'

রফিক সাহেব বুঝতে পারলেন, এরা প্রশ্ন পেয়েছে বটে, তবে তা স্বপ্নে নয়। পেয়েছে নেটে– হোয়াট্‌স অ্যাপ-ইমু-ভাইবারে। তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। এ কোন্ যুগে তিনি বাস করছেন? অফিসে পৌঁছে কলিগদের সাথে বিষয়টা আলোচনা করতে তারাও হতভম্ব হয়ে গেল। প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় না, প্রশ্নফাঁসের মত অতি স্বাভাবিক কিন্তু আলোচিত বিষয় রফিক সাহেব জানেন না বলে।

অবশ্য রফিক সাহেব একা নন, দেশে আরো কতিপয় গুণী ব্যক্তি আছেন, যারা একই ক্যাটাগরির। পার্থক্য হচ্ছে রফিক সাহেব প্রশ্নফাঁসের বিষয়টি জানেন না, আর তাঁরা প্রশ্নফাঁসের বিষয়টি মানেন না। এদের মধ্যে রয়েছেন মাননীয় একজন প্রতিমন্ত্রী। রাজবাড়ির এক অনুষ্ঠানে 'দেশে প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটেনি' দাবি করার পর সেখানে উপস্থিত কতিপয় শ্রোতা একে অন্যকে প্রশ্ন করেছেন– 'কোত্থেকে এসেছে?' মানহানি মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে এ বাক্যের ব্যাখ্যা আমরা করতে পারছি না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন এই দেশের ঐতিহ্যবাহী ও স্বনামধন্য একটি ছাত্রসংগঠনের প্রধান। তাদের হাঁকডাক ও উৎপাতে এই দেশে টেকা দায়। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, হলদখল ইত্যাদিসহ অল্পসময়ে বিপুল পয়সা হাতানোর কোনো ক্ষেত্রই তাদের নেকনজর থেকে রেহাই পায় না। এই ধরনের কোনো সুযোগ পাওয়ামাত্র দেশীয় অস্ত্র এবং বিদেশী হাতিয়ার নিয়ে তারা গর্জে ওঠেন, অতপর রিজিক অন্বেষণে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাদের কতিপয় কর্মী যে পরিমাণ বুলেট ব্যয় করেছেন তা অনেক সৈনিক তার ৩০/৩৫ বছরের সৈনিক জীবনেও ব্যয় করেননি বা করার সুযোগ আসেনি। সেই অর্থে বলা চলে, সামরিক বাহিনীর চেয়েও অভিজ্ঞ কিছু ব্যক্তি এই সংগঠনের স্কোয়াডে আছেন, যারা যে কোনো সময় যে কোনো ব্যক্তিকে 'ফেলে' দেয়ার ক্ষমতা রাখেন।

এমন একটি সুমহান ছাত্রসংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তাদের কেন্দ্রীয় সভাপতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল একটি টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে। সেখানে তিনি অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে অতি আস্থার সাথে বলেছেন, 'না তো! দেশে কোথাও প্রশ্নফাঁস হচ্ছে না।' উপস্থাপিকা ভাবলেন, তিনি হয়ত শুনতে ভুল করেছেন। তিনি প্রশ্নটি আবার করলেন। এবার সভাপতি সাহেব আরো স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'যেখানে আমাদের জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায়, সেখানে প্রশ্নফাঁসের মত কোনো ঘটনা ঘটতেই পারে না।' এবার উপস্থাপিকা যেন মাটি থেকে আকাশে পড়লেন। দিনের বেলা প্রখর রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘর্মাক্ত শরীরে কেউ যদি বলে 'আহ! রাতের এই আকাশে কী চমৎকার জোছনা!' তাহলে নির্বাক হওয়া ছাড়া আর কী উপায় থাকে!?

অবশ্য এমন কৌতুকপ্রিয় কিছু নেতা ও কর্মকর্তার বক্তব্য বাদ দিলে দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে প্রশ্নফাঁস এখন দিবালোকের মত পরিষ্কার বিষয়। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টা স্বীকার করে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল, এই অপকর্মের সাথে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার লোকজন জড়িত। শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে সরকারি প্রেসের লোকজন, ছাত্র, শিক্ষক,

অভিভাবক, প্রেস থেকে দুর্গম অঞ্চলের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র পৌছে দেয়ার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, ইন্টারনেটে পারদর্শী নীতিভ্রষ্ট তরুণ– সবমিলিয়ে অজস্র শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে জড়িত। সাথে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রযুক্তি; আরেকটু নির্দিষ্ট করে বললে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। শিক্ষাসচিব নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে বলেছেন, 'প্রশ্নফাঁস আগেও কমবেশি হত। তবে সেটার পরিসর ছিল সীমিত। কিন্তু এখন ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার, ইমো, হোয়াট্‌সঅ্যাপ, ভাইবারের (অ)কল্যাণে তা মহামারীর আকার ধারণ করেছে। কোনো এক উৎস থেকে একবার ফাঁস হলেই হল, প্রযুক্তির কল্যাণে মুহূর্তেই তা বিশ্বের এমাথা-ওমাথা হয়ে যাচ্ছে।'

প্রশ্নফাঁসের পর আসে এটা প্রতিরোধের প্রসঙ্গ। এক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের উদ্যোগগুলোতে একবার নজর বুলিয়ে নেয়া যাক।

–পরীক্ষা শুরুর ত্রিশ মিনিট আগে হলে প্রবেশ।

–কেন্দ্রের আশপাশে ২০০ মিটারের মধ্যে মোবাইল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা।

–প্রশ্নফাঁসে জড়িত কাউকে ধরিয়ে দিলেই পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার।

–আরো কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায় সে ব্যাপারে কমিটি গঠন।

–ইন্টারনেটের গতি কমিয়ে দেয়া।

আশংকা হচ্ছে, সামনে কবে যেন বলা হয়– পরীক্ষাই বন্ধ করে দিতে হবে। সমগ্র পরীক্ষাব্যবস্থা বাতিল করে দিলে সমস্ত প্রশ্নফাঁস চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। এ যেন মাথাব্যথার জন্য মাথাকাটা থিওরি!

যাই হোক, সমাধান নিয়ে ভাবার আগে একটা বিষয় সামনে রাখা উচিত– সমস্যা আসলে প্রযুক্তিগত নয়, আসল সমস্যা আমাদের মানসিকতায়। আমরা মানসিকভাবে পতিত হয়েছি, নীতিভ্রষ্ট হয়েছি। আমাদের কাছে শিক্ষা হল উদরপূর্তির হাতিয়ার। ভালো ফলাফল করা, বেশি বেতনের চাকুরি খুঁজে নেয়া আর বিলাসী জীবনযাপন করা। অতএব পড়ালেখা যাই হোক না কেন, ফলাফল ভালো করতে হবে। এ কারণেই ছাত্র ও অভিভাবক উভয়কেই নকলবাজিতে সমানতালে আগ্রহী দেখা যায়। ওপরের স্তরে তো বটেই, ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষাতেও দেখা যায় অভিভাবকরা জানালা দিয়ে ভেতরে নকল সাপ্লাই দিচ্ছেন। স্কুলের সুনামের আশায় শিক্ষকেরা হলের ভেতর উত্তর বলে দিচ্ছেন। এইসমস্ত কর্মকাণ্ডের একমাত্র ব্যাখ্যা দাঁড়ায়– 'যেভাবেই হোক পাশ করো'।

প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে আমাদের শিক্ষক-অভিভাবকগণ নিজেদের কর্তব্যজ্ঞান ভুলে শিশুদের কী শিক্ষা দিচ্ছেন? ৫ম শ্রেণি থেকেই যদি শিশুদেরকে 'অবৈধ পথে কার্য হাসিলের সবক রপ্ত করিয়ে দেয়া হয় তাহলে এরা বড় হয়ে জীবনের কোন্ অঙ্গন বাকি রাখবে? সুতরাং সবার আগে প্রয়োজন আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন। শিক্ষার উদ্দেশ্য সুশিক্ষিত, যোগ্য, সৎ ও মেধাবী জাতি গড়া, যারা ভবিষ্যতে শক্ত হাতে দেশকে পরিচালনা করবে। অবশ্য সেজন্য যথাযথ উপাদান আমাদের সিলেবাসে থাকতে হবে।

প্রশ্নফাঁসের অন্যতম কারণ আমাদের নৈতিকতার ধ্বস। প্রশ্নফাঁসের মাধ্যমে জাতিকে মূর্খ ও অযোগ্য করে ফেলা হচ্ছে– এমন ভয়াবহ অনৈতিক কাজে যারা জড়িত তাদের নৈতিকতায় যে ঘাটতি আছে তা বলাই বাহুল্য। চোখ বন্ধ করে বলা যায় এরা শুধু নামকাওয়াস্তে পড়ালেখাই করেছে। নীতি-নৈতিকতা শেখার ধারকাছ দিয়েও যায়নি। বর্তমানে আমাদের শিক্ষা সিলেবাসে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিরোনামে যতটুকু যা পড়ানো হয় তা অত্যন্ত অপ্রতুল এবং এটা পড়ানোও হয় চূড়ান্ত অবহেলার সাথে। অনেক জায়গায় দেখা গেছে ইসলাম ধর্মশিক্ষার বই পড়াচ্ছেন এমন শিক্ষকগণ যাদের মধ্যে ন্যূনতম ধর্মীয় জ্ঞানও নেই এমনকি কোথাও কোথাও হিন্দু শিক্ষকও! অথচ ৯০/৯৫ ভাগ ছাত্র মুসলমান! এই শিক্ষকগণ মুসলিম ছাত্রদেরকে ধর্মশিক্ষার বই কীভাবে পড়াবেন? এ ধরনের ঘটনা প্রমাণ করে, আমাদের শিক্ষা-সিলেবাসে ধর্মশিক্ষা চূড়ান্ত অবহেলার শিকার, যার পরিণতি এখন আমাদের ভুগতে হচ্ছে। এরা শুধু শিক্ষাই নিচ্ছে, দীক্ষাটা পাচ্ছে না কোথাও। অতএব দেশের মূলধারার যোগ্য আলেমসমাজের তত্ত্বাবধানে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার সিলেবাস নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। অতপর স্কুলপ্রতি অন্তত একজন যোগ্য দ্বীনদার শিক্ষক রেখে তাঁদের মাধ্যমে বাচ্চাদের হৃদয়গভীরে আল্লাহর ভয় ও নৈতিকতার শিক্ষা গেঁথে দিতে হবে।

এর পাশাপাশি দেশের সৎ ও সুশিক্ষিত সমাজের পরামর্শ নিয়ে প্রশ্নফাঁস রোধে যাবতীয় অন্যান্য উদ্যোগ ও আয়োজন বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলে আশা করা যায় প্রশ্নফাঁসের এই ভয়াবহ সংক্রমণ থেকে আমাদের দেশ ও জাতি রক্ষা পাবে। অন্যথায় একটা অশিক্ষিত, অযোগ্য, অর্থলিপ্সু ও উদরপূজারী একটা জাতির হাতে এই প্রিয় বাংলাদেশকে ছেড়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ●

'একদিন ওয়ালিদ ছাহেব বললেন, নূরুল হক্ব! গাঁয়ের কুয়ায় যেখানে মহিলারা পানি নিতে আসে সেই জায়গাটা পিচ্ছিল হয়ে গেছে। মহিলারা পানি আনতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে ব্যথা পায়। কলস ভেঙে যায়। তুমি যদি কুয়া থেকে পানি তোলার কাজটা করে দাও তাহলে ভালো হয়। ইতিহাসে আছে, চার বছর পর্যন্ত তিনি এই খেদমত করেন। নিজে কুয়া থেকে পানি তুলে চৌবাচ্চায় ভরে রাখতেন, এখান থেকে যার প্রয়োজন পানি নিয়ে যেত।

শৈশব থেকেই যিনি মানবসেবার শিক্ষা পেয়েছেন তার আগামী জীবন কেমন হবে তা তো বলাই বাহুল্য।'

কৈশোর

অবক্ষয়

লিখেছেন– আব্দুল্লাহ নাসীব

শিশু-কিশোররা আমাদের আশার প্রদীপ, উম্মাহর ভবিষ্যত। তাদের উন্নত জীবন গঠনের ব্যাপারে অবহেলা ও উদাসীনতার যেমন সুযোগ নেই তেমনি এক্ষেত্রে ভুল পথে যাওয়ারও অবকাশ নেই। আজ তাদের মানসপটে জীবনের যে ছবি অংকিত হবে ধীরে ধীরে তা-ই তাদের কর্ম-চরিত্রে প্রতিফলিত হবে। প্রযুক্তির কল্যাণে পশ্চিমা হিংস্রতা ও ভোগবাদে আমাদে . শিশু-কিশোরেরাও মর্মান্তিকভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। হিংস্রতাকেই তারা মনে করছে বীরত্ব, জুলুম-অত্যাচারকেই মর্যাদা ও নেতৃত্ব। সম্প্রতি রাজধানীর একটি অভিজাত এলাকায় সহপাঠীদের দ্বারা এক স্কুলছাত্রের ছুরিকাহত হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির

সংবাদ পত্র-পত্রিকায় এসেছে। কয়েক মাস আগে একই এলাকার নবম শ্রেণির এক ছাত্র তার সহপাঠীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের সূত্র ধরে পুলিশি অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছিল গ্যাং কালচারের ভয়াবহ সব তথ্য। সে সময় বিষয়টি নিয়ে মিডিয়ায় বেশ লেখালেখিও হয়েছিল।

এই হিংস্রতা ও জুলুম তো আমাদের পরিচয় ছিল না। আমাদের পরিচয় ছিল মমতা ও মানবসেবা। আমাদের শিশু-কিশোররাও বেড়ে উঠছিল সেই পরিবেশে। আমাদের যারা উত্তরসূরি, তাঁদের জীবন তো আলোকিত ছিল সেবা ও সদাচারে। শৈশব থেকেই তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। শায়েখ আলাউদ্দীন আলাউল হক্ব (১৩৯৮ হি.) রাহ.-এর সন্তান শায়েখ নূরুল হক্ব রাহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি তার ওয়ালিদ ছাহেবের খানকাহ্‌র সকল মেহমানের খিদমত নিজের যিম্মায় নিয়েছিলেন। তাদের কাপড়-চোপড় ধুয়ে দিতেন, পানি গরম করতেন, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে রাত-দিন তার শুশ্রূষায় মশগুল থাকতেন।

একদিন ওয়ালিদ ছাহেব বললেন, নূরুল হক্ব! গাঁয়ের কুয়ায় যেখানে মহিলারা পানি নিতে আসে সেই জায়গাটা পিচ্ছিল হয়ে গেছে। মহিলারা পানি আনতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে ব্যথা পায়। কলস ভেঙে যায়। তুমি যদি কুয়া থেকে পানি তোলার কাজটা করে দাও তাহলে ভালো হয়। ইতিহাসে আছে, চার বছর পর্যন্ত তিনি এই খেদমত করেন। নিজে কুয়া থেকে পানি তুলে চৌবাচ্চায় ভরে রাখতেন, এখান থেকে যার প্রয়োজন পানি নিয়ে যেত।

শৈশব থেকেই যিনি মানবসেবার শিক্ষা পেয়েছেন তার আগামী জীবন কেমন হবে তা তো বলাই বাহুল্য।

উর্দু ভাষায় 'বাড়োঁ কে বাচপান' একটি সুন্দর গ্রন্থ। তাতে আছে যে, তাবলীগের মারকায নিজামুদ্দীনে মেহমানদের ভিড় থাকত। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহ. সবসময় মেহমানদের সাথেই খানা খেতেন। মাওলানা ইউসুফ রাহ. (যিনি পরে তাবলীগের আমীর হয়েছিলেন)-এর বয়স তখন ছিল ১২-১৩ বছর। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহ. আগত মেহমানদের নাস্তা-খাবার ও আনুষঙ্গিক সকল কাজের দায়িত্ব তাঁর ওপর দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি সবার জন্য খাবার নিয়ে আসতেন। খাবারের পর খালি বরতন নিয়ে যেতেন।

মারকায সংলগ্ন মাদরাসায় ছাত্রদের খাবার-দাবারের সুব্যবস্থাপনা তখনও গড়ে ওঠেনি। ছাত্ররাই খাবার রান্না ও পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করত। মাওলানা ইউসুফ রাহ.-ও এইসকল কাজে শরীক থাকতেন।

একবারের ঘটনা, রান্নার জন্য তিনি জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনেছেন। কিন্তু তা ভালো শুকনা না হওয়ায় আগুন জ্বালাতে পারছিলেন না। শুধু ধোঁয়া হচ্ছিল এবং চোখের পানি পড়ছিল। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহ. দূর থেকে এই দৃশ্য দেখছিলেন। একপর্যায়ে নিজে এগিয়ে এসে একটি কাগজে আগুন ধরিয়ে দিলে আগুন জ্বলে উঠল। এরপর পুত্রকে বললেন, 'সব কাজই শিখতে হয়।'

এরকমের ঘটনা অনেক বলা যাবে। আমাদের ধারাই তো ছিল সভ্যতা-ভদ্রতার, দয়া-মহানুভবতার, সদাচার ও মানবসেবার। আমাদের শিশুরাও এভাবেই গড়ে উঠত। কিন্তু পশ্চিমা জীবনবোধ ও জীবনব্যবস্থার আগ্রাসনে এখন সবকিছুই তছনছ হয়ে যাচ্ছে। এখন বড়দের জীবন থেকে যেমন উন্নত ও সদ্গুণাবলি হারিয়ে যাচ্ছে তেমনি শিশু-কিশোরেরাও হারিয়ে ফেলছে তাদের নির্মল শৈশব, দুরন্ত কৈশোর। এর পরিবর্তে তাদের হাতেখড়ি হচ্ছে, নেশা, সন্ত্রাস ও খুনোখুনির মত জঘন্য বিষয়াদিতে।

আমাদের ফিরে যেতে হবে আমাদের মহান ঐতিহ্যের দিকে। পরিবার ও সমাজ সকল ক্ষেত্রে সুস্থ জীবনবোধ ও সদ্গুণাবলির চর্চা বাড়াতে হবে। আমাদের শিশু-কিশোরদের সামনে আমাদেরকে উপস্থাপন করতে হবে 'বড়'র আদর্শ-রূপ। শিশুরা স্বভাবতই 'বড়' হতে চায়। কিন্তু সেই 'বড়'র রূপটি এখন তাদের সামনে কী? নেশা ও সন্ত্রাস নয় কি? বিশ্ববিদ্যালয়ে র‌্যাগিংয়ের নামে 'ছোট'দের উপর জুলুম চালানো নয় কি? রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এহসান রফিকদের রাতভর নির্যাতন করে চোখ নষ্ট করে দেওয়া নয় কি? এই ধারা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। পশ্চিমা জীবনবোধ ও জীবনযাত্রার মোহ থেকে এখনি যদি আমরা বেরিয়ে আসতে না পারি তাহলে শুধু নিজেদের উপরই জুলুম করব না, ভবিষ্যত প্রজন্মের উপরও নির্মম জুলুম করে যাব। ●